মাদিগের সহিত মিলিত হন নাই, এমন এত ব্রাহ্ম রহিয়াছেন যে তাঁহাদের সংখ্যা তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। তোমারদের ও তাঁহারদের সকলেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যদি সকলকে সাধারণ মনে করিয়া তাঁহারদের জন্য অপর দিনে উপাসনা করিবার প্রস্তাব করিয়া থাক, তাহা হইলে এ প্রস্তাব নিতান্ত অনাবশ্যক হইয়াছে। কেন না উপাসনার জন্য যে যে দিন নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সাধারণ ব্রাহ্মগণেরই জন্য। কেবল ব্রাহ্মসাধারণের জন্যও নয়, সর্ব্বসাধারণের জন্য।" *

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত।)

আমরা দেশ কালের তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে তৎসংক্রান্ত নানা প্রকার বিভিন্নতা দেখিতে পাই। প্রথম, দেশ হইতে কালের বিভিন্নতা; দ্বিতীয়, অসীম দেশ-কাল হইতে সসীম দেশ-কালের বিভিন্নতা; তৃতী[illegible] কাল হইলে দেশকালান্তরের বিভিন্নতা; চতুর্থ, বর্ত্তমান কাল হইতে ভূত-ভবিষ্যতের বিভিন্নতা; পঞ্চম দৈর্ঘ প্রস্থ এবং বেধের বিভিন্নতা। সৃষ্টি আলোচনার সময় দেশ কালের অতীত পরমাত্মার সহিত দেশ কালের অন্তঃপাতী জগতের সম্বন্ধ আলোচনার সময়—তিনটি মাত্র মুল বিভিন্নতা সাংখ্যকারের মনে হইয়াছিল। কি? না ত্রিগুণের পরস্পর বিভিন্নতা, ত্রিগুণ-সাম্য হইতে ত্রিগুণ-বৈষম্যের বিভিন্নতা এবং আত্মা হইতে ত্রিগুণের বিভিন্নতা। সাংখ্য-দর্শন ঈশ্বর-বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই, দুই একটি কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা না বলারই মধ্যে। ঈশ্বরের সহিত ত্রিগুণের ভিন্নতা কিরূপ এবিষয়ে নিরীশ্বর সাংখ্য কিছুই বলেন নাই বটে কিন্তু সেশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জল তাহা বলিতে ত্রুটি করেন নাই। পাতঞ্জল বলিয়াছেন "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" অবিদ্যামূলকযে ক্লেশ এবং কর্ম্মফল-পরিপাকের আধার যে সংস্কারাত্মক বাসনা সমুহ তাহা হইতে নির্লিপ্ত পুরুষ বিশেষই ঈশ্বর। সাংখ্য মতে আত্মামাত্রই নির্গুণ কিন্তু ত্রিগুণের সংসর্গদোষে জীবাত্মা নির্গুণ হইয়াও সগুণ; সাধন বিশেষ-দ্বারা ত্রিগুণের সঙ্গ-ত্যাগ করিতে পারিলেই তবে তিনি আপনার স্বরূপ লাভ করেন—নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ করেন—আপনি যাহা তাহাই হন, যতক্ষণ তাহা না হন ততক্ষণ আপনি যাহা নহেন তাহাই আপনাকে মনে করেন; দুঃখ সুখ মোহপাশে বদ্ধ মনে করেন। এই রূপ বন্ধন-সংস্কারই জীবাত্মার বন্ধন, এবং তাহা হইতে মুক্তিই জীবাত্মার মুক্তি সাংখ্যের এই প্রকার মত। কি উপায়ে জীব মুক্তিলাভ করেন? না সত্ত্বগুণের উৎকর্ষসাধন দ্বারা। (পাতঞ্জল বলেন) কিন্তু ঈশ্বরেতে নিত্য কালই সত্ত্ব-গুণের উৎকর্ষ রহিয়াছে—তাহাতে সাধনের অপেক্ষা নাই; "তস্য চ তথাবিধমৈশ্বর্য্যম্ অনাদেঃ সত্ত্বোৎকর্ষাৎ।"

ঈশ্বর-সম্বন্ধে পাতঞ্জলের মনোগত অভিপ্রায় এইরূপ। সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণ জীবাত্মাকেই বন্ধন করিতে পারে, পরমাত্মাকে নহে। কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, পরমাত্মাতে যদি সত্ত্বগুণ (প্রকাশক বস্তু) না থাকে তবে "তিনি স্বপ্রকাশ" এ কথা কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, সত্ত্বগুণ পরমাত্মাকে প্রকাশ করিবে কি, পরমাত্মার প্রকাশ দ্বারাই সত্ত্বগুণ অনুপ্রকাশিত হইতেছে—সত্ত্বগুণ পরমাত্মার প্রকাশের অনুপ্রকাশ মাত্র। যে-প্রকাশ বিরোধী বস্তু দ্বারা বাধা পাইতে পারে তাহাই সত্ত্বগুণের প্রকাশ। দৈর্ঘ প্রস্থ বেধের ন্যায় সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণ পরস্পরাপেক্ষ অর্থাৎ বস্তু বিশেষে দৈর্ঘ-প্রস্থ বেধের যেমন ন্যূনাধিক্য দেখা যায় তেমনি বস্তু-বিশেষে গুণ তিনটির ন্যূনাধিক্য হইতে পারে, কিন্তু কোন একটি গুণ মূলেই নাই এরূপ হইতে পারে না। এক খণ্ড স্বর্ণকে যদি দৈর্ঘে বাড়াও, তবে তাহার প্রস্থ এবং বেধ কমিয়া যাইবে, প্রস্থে বাড়াও দৈর্ঘ এবং বেধ কমিয়া যাইবে; বেধ বাড়াও দৈর্ঘ এবং প্রস্থ কমিয়া যাইবে, কিন্তু সহস্র কমিলেও তিনের কোনটি আদবেই নাই এরূপ হইতে পারিবে না। এই কাগজটির বেধ এত অল্প যে তাহা মনে ধারণা করাই সুকঠিন, কিন্তু তাহা আছে-যে তাহাতে আর সংশয় নাই। যেমন দৈর্ঘ বেধ-বিহীন প্রস্থ থাকিতে পারে না প্রস্থ-বেধ-বিহীন দৈর্ঘ থাকিতে পারে না, দৈর্ঘ-প্রস্থ-বিহীন বেধ থাকিতে পারে না, সেইরূপ কোন বস্তুতে সত্ত্বরজো-বিহীন তমঃ অথবা তমরজোবিহীন সত্ত্ব, অথবা সত্ত্ব-তমো-বিহীন রজঃ একাকী থাকিতে পারে না। সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণ এইরূপ আপেক্ষিক। কিন্তু ঈশ্বরের যে প্রকাশ মহিমা তাহা প্রাকৃতিক সত্ত্ব-গুণের ন্যায় আপেক্ষিক নহে, তাহা বাধা-গ্রস্থ নহে, এজন্য যদি ইচ্ছা কর তবে তাহাকে শুদ্ধসত্ত্ব বলিতে পার, কেবল এইটি মনেরাখিও যে, তাহা সত্ত্বরজস্তমোগুণের ভিতরকার

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৭৮৭ শক।

বাধাযুক্ত সত্ত্বগুণ নহে, প্রকৃতির ভিতরকার সত্ত্বগুণ নহে, রজস্তমোঽপেক্ষ সত্ত্বগুণ নহে অর্থাৎ তাহাকে সত্ত্বগুণ না বলিলেই ভাল হয়। কেননা যাঁহার প্রকাশেতে করিয়া সত্ত্বগুণ অনুপ্রকাশিত হয়, তাঁহাকে সত্ত্বগুণ বলিলে ভ্রমোৎপত্তির একটি পথ খুলিয়া রাখা হয়। পাতঞ্জল যে বলিয়াছেন ঈশ্বরেতে সত্ত্বগুণ ঐকান্তিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, তাহা রজস্তমো কর্ত্তৃক কিছুমাত্র বাধা-গ্রস্থ নহে, সুতরাং তাহা প্রাকৃতিক সত্ত্বগুণ হইতে ভিন্ন। ইতিপূর্ব্বে যাহা একবার বলিয়াছি তাহা আবার বলি ; পীতবর্ণ উপচ্ছটা যেমন মূল চ্ছটার সদৃশ আবির্ভাব, রক্তবর্ণ কলুষিত আবির্ভাব, নীলবর্ণ বিসদৃশ আবির্ভাব ; সেইরূপ সত্ত্ব-গুণ ঐশী শক্তির সদৃশ আবির্ভাব, রজোগুণ কলুষিত আবির্ভাব, এবং তমোগুণ বিসদৃশ আবির্ভাব। বিভিন্নতা ব্যতিরেকে জগতের অভিব্যক্তি সম্ভবে না, ত্রিগুণের বিভিন্নতাই আর আর সমুদায় বিভিন্নতার মূলে বর্ত্তমান আছে। সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের সদৃশ আবির্ভাব হইলেও তাহা আবির্ভাব মাত্র, ছায়া মাত্র—সুতরাং ঈশ্বরের স্বপ্রকাশ মহিমা হইতে তাহা ভিন্ন। পরমাত্মার যে স্বপ্রকাশভাব তাহা ত্রিগুণাতীত।

অতঃপর ত্রিগুণাত্মক জগৎসৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং ক্রম কিরূপ তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

BRAHMA SOMAJ OF THE PUNJAB.

Dated Lahore, the 22rd June, 1878.

No.
From
The Secretary of the Brahma Somaj
of the Punjab, Lahore.
To
The Secretary,
Adi Brahma Somaj,
Calcutta

Sir,

In accordance with a resolution passed at a meeting of the members of the Brahmo Somaj Punjab held on the 19th Instant, I beg to send you copy of the following resolution and request its insertion in your organ for the information of the other Samajes.

Proposed by Babu Brojolal Ghose and seconded by Pundit Shiva Narayn and passed unanimously.

That the Punjab Brahma Somaj has acted independently up to this time and desires to act in the same way for the future, consequently it will continue to co-operate with all the Brahmo Somajes for the diffusion of Theism and other beneficent work.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obdt. Servant
Banee Pershad.

THE HINDU SOMAJ.

It is highly derogatory to enlightened Hindus that they resort to hypocrisy. The Hindu Shastras have plainly stated that there is only One God and that He is immaterial. It is obviously for the uneducated that the worship of the Deity in imaginary forms has been allowed. But it is highly derogatory to the educated Hindus that they voluntarily degrade themselves to the level of their uneducated brethren inasmuch as they do not evince the moral courage of stating that they believe according to the instructions of the Shastras, in a figureless Deity. This behaviour is quite opposed to Hindooism and ignores the distinction of the educated and uneducated made in the Shasters. It is a matter of deep regret that Non-Hinduism is non-adays passing for Hinduism so much so that an orthodox Hindu will not venture to acknowledge that he worships a formless God in accordance with the higher portion of the Shasters. He will rather dissemble his opinion or resort to silence in an enquiry concerning his religion. This silence or hypocrisy is not at all demanded by orthodoxy which allows a broad margin for the most refined faith tha[illegible] can possibly have. Hypocrisy or sile[illegible]ing faith and that too resorted to gratuitously, is fertile in mischief. It is supremely hostile to truth and its propagation and consequently to a healthy development of society. If Hinduism be faithfully followed, then there will be very little doctrinal distinction between Brahmas and the enlightened Hindus. The Adi Somaj, as a writer in the *Tattwabodhini Patrika* has truly called it, is the refined Hindu Somaj but strange to say that even enlightened Hindus shrink from identifying themselves with that Somaj. The sacrifice of truth to interest is a gigantic calamity and is made without any imperious necessity as stated hereinbefore. Such a sacrifice, though for the sake of some necessity, is not justifiable and how much the mischief is aggravated in a case where there is no sort of necessity needs scarcely be mentioned.

(To be continued.)

KISSORILAL ROY.

Registerd No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
চতুর্থ ভাগ
ভাদ্র ১৮০০ শক।

৪২১ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

তেন কিং।

যদি আমি ব্যাধি-শয্যায় পতিত থাকিয়া শারীরিক অসুখে অস্থির হই, যদি রোগের যাতনা নিবন্ধন দণ্ড, পল, অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী বোধ হয় এবং জগতের কোন বস্তু ভাল না লাগে, "তেন কিং ?" তাহাতেই বা কি? পরম ভিষক ত আমার নিকটে আছেন, তিনি ত আমার গাত্রে হস্ত বুলাইতেছেন, তিনি ত আমাকে মাতার ন্যায় যত্ন করিতেছেন, তিনি ত হয় আমাকে আরোগ্য প্রদান করিবেন নয় পরম বন্ধু মৃত্যুর সহায়তা দ্বারা জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ ধামে লইয়া যাইবেন, এই সকল চিন্তার দ্বারা আমি মনকে সুস্থির রাখিতে পারি। যদি দারুণ দ্রারিদ্র্যাবস্থায় পতিত হই, যদি কেবল শাকান্ন আহার করিয়া কাল যাপন করিতে হয়, যদি সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা কিছুমাত্র উপভোগ করিতে না পাই, যদি সকলে অবজ্ঞা করে, যদি অনিত্য ঐশ্বর্য্য-মদে স্ফীত ব্যক্তিরা আমাকে তাচ্ছিল্য করে, "তেন কিং ?" তাহাতেই বা কি? যদি আমার সামান্য অর্থ না থাকে পরমার্থ ত আমার আছে, যদি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ধনাগার না থাকে সন্তোষের ধনাগার তো আমার আছে, যদি দাস দাসী না থাকে তথাপি ধৈর্য্য,তিতিক্ষা,ঈশ্বর-প্রীতি, ও দয়ারূপ সহচর সহচরী ত আমার আছে। যদি অন্যায় রূপে আমার অযশ সর্ব্বত্র পরিঘোষিত হয়,যদি যেখানে কেবল আদর প্রাপ্ত হইতাম সেখান হইতে উদাসীন ব্যবহার প্রাপ্ত হই,যদি যেখানে যাই সেইখান হইতে লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হই, যদি সকলে আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে "তেন কিং ?" তাহাতেই বা কি? আমি ত মনে জানি যে আমার নিজের কোন দোষ নাই, আমি ত মনে জানি যে কেবল যাঁহার নিকট আমি আমার কার্য্যের জন্য দায়ী তিনি ত আমার প্রতি প্রসন্ন আছেন। যদি অন্যায় রাজাজ্ঞায় আমাকে দ্বীপান্তরিত হইতে হয়, যদি যে স্থানের সহিত আমার বালসখিত্ব, যে স্থান আমার প্রাণপ্রিয়জনদিগের আবাস, সেই স্থান সেই আজ্ঞাক্রমে পরিত্যাগ করিতে হয়, "তেন কিং ?" তাহাতেই বা কি? সেই দ্বীপে যে পৃথিবী সকল-মনুষ্যের সাধারণ গৃহ সেই পৃথিবী ত আমার থাকিবে, যে সূর্য্য আমার স্বদেশে সমুদিত হইয়া সকল জীবের মনে

আহ্লাদ সঞ্চার করিতেছে সেইখানেও সেই সূর্য্য সমুদিত হইয়া সমস্ত জগৎকে আহ্লাদিত করিবে, যে চন্দ্র স্বকীয় সুধাময় কিরণ দ্বারা স্বদেশকে রজতরঞ্জনে রঞ্জিত করিতেছে, সেই চন্দ্র সেই স্থানকেও স্বকীয় সুধাময় কিরণ দ্বারা রজতরঞ্জনে রঞ্জিত করিবে, এখানেও যে অন্তরতর অন্তরতম পরমাত্মাকে ধ্যান করিয়া প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইতেছি, সেখানেও সেই অন্তরতর অন্তরতম পরমাত্মাকে ধ্যান করিয়া প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইব। মৃত্যু যদি এক্ষণেই স্বকীয় তীক্ষ্ণ করবাল দ্বারা আমার পৃথিবীস্থ শিবির-রজ্জু ছেদন করে "তেন কিং?" তাহাতেই বা কি? আনন্দের দ্বার হইতে ভয়ের সহিত বিমুখ হওয়া আমার রীতি নহে। যদি প্রলয়কাল এখনি উপস্থিত হয়, যে আকর্ষণ-সূত্রে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু গ্রথিত রহিয়াছে তাহা যদি এক্ষণই বিচ্ছিন্ন হইয়া সে সকল জ্যোতিষ্ক মণ্ডল পরস্পরের প্রতি পরস্পর প্রতিঘাত পূর্ব্বক চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে থাকে "তেন কিং" তাহাতেই বা কি? আমি নিশ্চয় জানি যে আমার অমর আত্মা কখন বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না, উহা চির যৌবনান্বিত হইয়া সেই অমৃত পুরুষের সঙ্গে অমৃত উপভোগ করিবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃতি

যখন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হন তখন তিনি ও তাঁহার অনুবর্ত্তি ব্রাহ্মেরা তথায় স্বতন্ত্র এক দিন উপাসনার জন্য প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট আবেদন করাতে এবং তিনি সেই আবেদন গ্রাহ্য না করাতে সম্প্রতি কতকগুলি ব্রাহ্ম তাঁহাদের মুখস্বরূপ কোন কোন সংবাদ পত্রে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপর দোষারোপ করিতেছেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে যদি প্রধান আচার্য্য মহাশয় কেশবচন্দ্র সেনের দলকে আদি ব্রাহ্মসমাজে স্বতন্ত্র দিনে উপাসনা করিতে দিতেন তাহা হইলে ঐ দল হইতে পৃথক হইয়া সম্প্রতি যে এক ব্রাহ্মদল স্বতন্ত্র সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও সমাজে আর এক দিন উপাসনা করিতে দিতে হয়। কে জানে যে ভবিষ্যতে এই দল হইতে আর এক ব্রাহ্মদল বহির্গত না হইবে? সে দল উৎপন্ন হইলে তাহাকেও আর এক দিন উক্ত সমাজে উপাসনা করিতে দিতে হইবে এই রূপ যদি এক শত ব্রাহ্মদল হয় তাহাদিগের প্রত্যেককে সমাজে এক এক দিন উপাসনা করিতে দিতে হইবে। রামমোহন রায়ের ট্রষ্ট ডীডে লিখিত আছে যে, সকল ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যেরা উক্ত সমাজে সমাগত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে, অতএব ব্রাহ্মদলকে কেন, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান, ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রত্যেক দলকে সমাজে উপাসনা করিতে দিতে হয় কিন্তু পৃথিবীতে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত এত দল আছে যে এই রূপ করিয়া স্বতন্ত্র দিনে সকল দলকে উপাসনা করিতে দিলে কোন একটি বিশেষ দলের ভাগ্যে পুনরায় এক দিন তথায় উপাসনা করা ঘটিয়া উঠে কি না সন্দেহ।

স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে এরূপ করিয়া ধর্ম্ম-বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতা ও দলাদলিকে প্রশ্রয় দেওয়া রামমোহন রায়ের অভিপ্রায় নহে। তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা এক সময়ে একাসনে বসিয়া সকল জাতির সাধারণ পিতা সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে।

পৌত্তলিকতা।

যে সকল ব্রাহ্ম অন্য ব্রাহ্মের প্রতি সহসা পৌত্তলিকতা-দোষ আরোপ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের বিবেচনার্থ এই কয়েক পংক্তি অর্পিত হইতেছে।

ব্রাহ্মেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে পরব্রহ্মরূপে কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা করিবেন না অতএব পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগের অবশ্য পরিহার্য্য। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পৌত্তলিক ব্যবহার আপনা হইতে ক্রমে ক্রমে অনেক কমিয়া আসিতেছে। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই কোন প্রচলিত ধর্ম্মোৎসবে প্রতিমার উপাসনা করেন না ও প্রতিমাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন না। ব্রাহ্মেরা এপ্রকার পৌত্তলিকতা অনায়াসে পরিহার করিতে পারেন কিন্তু আর এক প্রকার পৌত্তলিকতা পরিহার করা তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন হয়। হিন্দুসমাজের গঠনে পৌত্তলিকতা ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে এই জন্য ব্রাহ্মেরা অন্যান্য বিষয়ে পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়াও শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি গার্হস্থ ক্রিয়ায় পৌত্তলিকতা পরিহার করা দুষ্কর বোধ করেন, তথাপি এক্ষণে দেখা যায় যে অনেক ব্রাহ্ম নির্দ্দিষ্ট প্রচলিত পদ্ধতির পৌত্তলিক অংশ পরিত্যাগ করিয়া সেই পদ্ধতির অনুসরণ করেন। যাঁহারা উন্নতিশীল ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন,তাঁহারা যে সকল ব্রাহ্মকে পৌত্তলিক মনে করেন তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেককে ক্রিয়াকালে প্রচলিত পদ্ধতির পৌত্তলিক অংশ পরিত্যাগ করিয়া সেই ক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখা যায়। অনেক ব্রাহ্ম কোন নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ব্রাহ্ম-পদ্ধতির অনুসরণ না করিয়া এই রূপ করিয়া থাকেন কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতির কোন্ অংশ পৌত্তলিকতা-দোষ-সংসৃষ্ট ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তদ্বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যাহা পৌত্তলিকতা মনে করেন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুবর্ত্তি ব্রাহ্মেরা তাহা পৌত্তলিকতা মনে করেন না। আবার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুবর্ত্তি ব্রাহ্মেরা যাহা পৌত্তলিকতা মনে করেন আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা তাহা পৌত্তলিকতা মনে করেন না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষার্থ এই বিষয়ে পরস্পরের প্রতি পরস্পর ঔদার্য্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কোন ব্রাহ্ম সম্পূর্ণ রূপে প্রচলিত পদ্ধতির অনুসরণ করিলে তাঁহাকে অনুযোগ করা যাইতে পারে কিন্তু তিনি যদি প্রচলিত পদ্ধতির পৌত্তলিক অংশ পরিবর্জ্জন কালে কোন বিশেষ অংশ আপত্তিজনক মনে না করিয়া তাহার অনুসরণ করেন কিন্তু আমি সে অংশ পৌত্তলিকতা দোষ-সংস্পৃষ্ট মনে করি তাহা হইলে তাঁহার উপর পৌত্তলিকতা-দোষ আরোপ করা আমার পক্ষে উচিত হয় না। আমি প্রচলিত পদ্ধতির যে অংশ পৌত্তলিকতা-সংসৃষ্ট মনে করি তাহা আর এক জন অপৌত্তলিক ব্রাহ্মকে তাঁহার নিজের অনভিমতে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা এক প্রকার আধ্যাত্মিক পীড়ন বলিতে হইবে। এ বিষয়ে প্রত্যেকের স্বাধীনতা থাকা কর্ত্তব্য। কাহারও ধর্ম্ম-বিবেকের স্বাধীনতা অপহরণ করা কর্ত্তব্য নহে।

অবশেষে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই কোন ব্রাহ্ম পৌত্তলিক ব্যবহার করিলে যাঁহারা হুলস্থূল উপস্থিত করেন তাঁহারা বাহ্য পৌত্তলিকতার বিষয় যত ধরেন আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতার বিষয় তত ধরেন না কেন? বাহ্য পৌত্তলিকতা অপেক্ষা কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি রূপ পুত্তলিকার উপাসনা যে আরো ভয়ানক। এতদ্ব্যতীত কোন বিশেষ জাতিকে সমাজের সম্পূর্ণ আদর্শ জ্ঞান করা

রূপ সামাজিক পৌত্তলিকতা আছে। কোন কোন ব্রাহ্ম ইংরাজ জাতিকে যে উপাস্য পুত্তলিকা করিয়া তুলিয়াছেন সে পৌত্তলিকতা পরিহারের উপায় কি? সম্প্রতি কোন প্রবীণ ব্রাহ্ম কোন ব্রাহ্ম সম্বাদ পত্রে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে যাঁহারা বিদেশীয় রীতি নীতি অবলম্বন করেন তাঁহারাই উন্নতিশীল ব্রাহ্ম-পদের বাচ্য-যেন ধুতি চাদর পরিয়া উন্নতিশীল ব্রাহ্ম হইতে পারা যায় না। ইহা অপেক্ষা সামাজিক পৌত্তলিকতা আর অধিক হইতে পারে না।

মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ইউরোপের উপকার সাধন।

৪২০ সংখ্যক পত্রিকার ৭৮ পৃষ্ঠার পর।

আরবেরা বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে অল্প মনোযোগী ছিল না। হাকেমের রাজত্ব-কালে করডোবা নগরে আশিটি মহাবিদ্যালয় ছিল; এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে গ্রানাডা নগরে পঞ্চাশটি ঐরূপ বিদ্যালয় ছিল। বোগদাদ নগরে একটি মহাবিদ্যালয় সংস্থাপনে ১০ লক্ষ-মুদ্রা ব্যয়িত হয়। ঐ বিদ্যালয়ে প্রায় ছয় সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন করিত এবং উহা হইতে প্রতি বৎসরে পঁচাত্তর সহস্র টাকা আয় হইত। ওমিয়া বংশের যুবরাজেরা স্পেনের বিদ্যালয় সমূহে অধ্যয়ন করিতেন এবং পুরস্কার লাভার্থে নানা প্রকার পরীক্ষা দিতেন। আরব রাজগণ কর্ত্তৃক সামান্য বিদ্যা শিক্ষার জন্য অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। সুবিখ্যাত হারুণঅলরসিদ আপন রাজ্যে বহু সংখ্যক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং এক জন নেষ্টোরয়নি সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টীয়ানকে ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয়ান রাজগণ হারুণের এই কার্য্য হইতে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ঔদার্য্য বিষয়ে উপদেশ লাভ করিতে পারেন। এই রূপে আরবেরা দুই শতাব্দীর মধ্যে মানবজাতির মানসিক উন্নতির জন্য এমন উপায় সকল অবলম্বন করিল যে আরবদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক রাজাদিগের সময়ে এলেকজেণ্ড্রিয়া ব্যতীত কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্ট হয় নাই।

আরবেরা এই রূপে পুরাতন জ্ঞান খনির আবিষ্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া আপনাদিগের ভাষায় একটি নূতন সাহিত্য প্রস্তুত করিতে অল্প চেষ্টিত ছিল না। তাহারা তৎকালে যে সকল নূতন অতীব শোভনীয় সাহিত্য-রচনা করিয়াছিল তৎসমুদয় অদ্যাপি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বিশেষ সম্মান ও প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই কালের আরবীয় সাহিত্য অতিশয় বিস্তৃত এবং উহার ভাষা অতি সুন্দর ও সুমার্জ্জিত ছিল। বিশেষতঃ স্পেন দেশীয় আরবেরা ধীশক্তির অত্যন্ত উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ সকল উল্লিখিত গুণের জন্য আরও অধিকতর বিখ্যাত ছিল। কেবল করডোবা মালাগা, আলমিরা, এবং মুরসিয়া নামক স্থানে প্রায় তিন শত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক এবং অন্ধ ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত দেশের সাহিত্য-ভাণ্ডারের বৃদ্ধি কল্পে সহকারিতা করিয়াছিল; এবং এক জন আরব গ্রন্থকার ইতিহাস, আইন, নীতিশাস্ত্র ও ভৈষজ্য বিদ্যা প্রভৃতি পরস্পর বিভিন্ন বিষয়ে এক সহস্র পঞ্চাশ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আরব গ্রন্থকর্ত্তাদিগের রচনা সংক্ষেপতঃ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে, প্রথম দর্শন; দ্বিতীয় বিজ্ঞান; তৃতীয় সাধারণ সাহিত্য। এই কয়েক বিষয়ে তাহাদিগের উন্নতির সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিবার মানস করি।

এসিয়াখণ্ডে পৃথিবীস্থ ছয়টী প্রধান প্রধান ধর্ম্ম প্রথম সম্ভূত হয় এবং অদ্যাপি অল্প বা অধিক উন্নত অবস্থায় সে সকল ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। ধর্ম্মালোচনাপরায়ণ এসিয়ানিবাসীদিগের মধ্যে গভীর ও নিগূঢ় চিন্তার প্রতি আগ্রহ চিরকাল পরিলক্ষিত হয়। আরবেরা ইহার ব্যভিচার-স্থল ছিল না। আরবেরা দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় এরূপ উদ্যমের সহিত প্রবৃত্ত হইয়াছিল যে স্পেন দেশীয় এস্কুরিয়েল নামক বিশাল পুস্তকাগারের অর্দ্ধ অন্ধকারময় গৃহে যে বিখ্যাত পুস্তক সংগৃহীত ও পরিরক্ষিত আছে তাহার নবমাংশের একাংশ আরব গ্রন্থকর্ত্তাদিগের কর্ত্তৃক প্রণীত ন্যায় ও তত্ত্ববিদ্যা-সংক্রান্ত গ্রন্থ। গ্রীক দার্শনিকদিগের মধ্যে এরিষ্টটলের দার্শনিক প্রণালীতে স্থানীয় বিশেষত্ব অতি অল্পই ছিল এই জন্য তাহা এসিয়াবাসীদিগের মনের সহিত যেমন মিলে এমন অন্য গ্রীক দর্শন-কর্ত্তার প্রণালী মিলে না। আরবেরা তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়াছিল। এই সময়ে ইউরোপবাসী খ্রীষ্টীয়ানেরা এরূপ অজ্ঞ ছিল যে তাহারা বহু-পুরুষ-পরম্পরা এরিষ্টটলের গ্রন্থ গ্রীকভাষাতে অধ্যয়ন করিতে অসমর্থ ছিল, আরবেরা তাঁহাদিগকে আরিষ্টটলের গ্রন্থের সহিত প্রথম পরিচয় করিয়া দেয়। আরবদিগের এই অত্যারূঢ় গুরুভক্তি কোন কোন বিষয়ে তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, যেহেতু তাহারা স্বকপোল চিন্তার মনোরম ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া টীকাকারের নীরস ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ইহা দ্বারা অন্যান্য বিষয়ে তাহাদিগের মহোপকার সাধিত হইয়াছিল। মুসলমান জ্ঞানীরা বুদ্ধি ও বিবেক শক্তি পরিচালনায় অভ্যস্ত হইয়া জাতীয় ধর্ম্মের ভ্রম সকল অনুভব করিতে সক্ষম হয়, এবং অপেক্ষাকৃত সঙ্গত ও উন্নত মত অবলম্বন করিতে প্রয়োজিত হয়। অদ্বৈতবাদ জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত হইয়া পরিশেষে সেই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ পদার্থেই বিলীন হয় এই বিশ্বাসটি শিক্ষা দেয়; শিক্ষিত এসিয়ানিবাসীদিগের মনের সহিত সেই অদ্বৈতবাদের চিরকালই মৈত্রী ভাব দৃষ্ট হয়; এই অদ্বৈতবাদ আরব দার্শনিকদিগের দ্বারা সাধারণতঃ আদরের সহিত গৃহীত হইল। এবারুস নামক বিখ্যাত আরব দার্শনিক এবং তাঁহার সমব্যবসায়ীরা যে সকল প্রশস্ত গৃহে উপদেশ দিতেন সে সকল গৃহ এক্ষণে সমভূম হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল এক্ষণে পণ্ডিতসমাজে অধীত হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহারাই মধ্য কালে ইউরোপখণ্ডে প্রথম সেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার ভাব উদ্দিক্ত করিয়াছিলেন যাহার প্রভাবে আমরা এক্ষণে স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞান আলোচনার সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছি।

গ্রীক বিদ্যা আলোচনা করিয়া আরবেরা কেবল বহুল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করিয়াছিল এমত নহে, হিপার্কস ও আর্কিমিডিস প্রভৃতি গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বৈজ্ঞানিক সত্য সকলের আবিষ্ক্রিয়ার প্রকৃত উপায়ও শিক্ষা করিয়াছিল। দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্ক্রিয়ার প্রণালী এথেন্স ও আইওনিয়াতে অবলম্বিত হয় নাই কিন্তু পরিশেষে উহা আলেকজেণ্ড্রিয়ার বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হওয়াতে অনেক আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয়। আরবেরা এই প্রণালী অন্ধকার হইতে উদ্ধার করে, এবং পুনরায় পদার্থবিদ্যার আলোচনায় নিয়োগ করিয়া অনেক সত্যের আবিষ্ক্রিয়ায় কৃতকার্য্য হয়। ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়াই গেলিলিও ও নিউটন অত্যাশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক সত্য সকল

আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। আরবেরা সকল বিজ্ঞান শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গণিত শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করিত। আরবেরাই প্রথমতঃ দশ গণিতাঙ্ক ইউরোপে প্রচলিত করে এবং বীজগণিত সম্বন্ধীয় কতকগুলি অত্যাবশ্যক সত্য আবিষ্কৃত করিয়া ঐ বিদ্যানুশীলনের উন্নতি সাধন করে। ত্রিকোণমিতি গণিত আরবদিগের পরিচিত ছিল। আরবেরাই এই গণিতকে ইহার বর্ত্তমান আকার প্রদান করে। বোগদাদ নগরের স্থাপনকর্ত্তা আলমনসর নিজে জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। আলমামন প্রাচীন-মত-ভক্ত ব্যক্তিগণের লাঞ্ছনা তুচ্ছ করিয়া আপন অধিকারে নিযুক্ত জ্যোতির্ব্বেত্তাগণের সাহায্যে ভৌগোলিক চক্রের একটি অক্ষাংশ পরিমাণ করাইয়া পৃথিবীর পরিধি দ্বাদশ সহস্র ক্রোশ স্থির করেন। এই সত্যটি ইহার অগ্রে কেহ আবিষ্কার করে নাই, এমন কি ইহার সাত শতাব্দি পরে কলম্বস ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়া পৃথিবীর যে পরিধি স্থির করিয়াছিলেন তাহা ভ্রমাত্মক। কয়েক শতাব্দির মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ, বিষুব কাল, সূর্য্যক্রান্তি, গ্রহদিগের সংযোগ, নক্ষত্রদিগের অদর্শন কাল, প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্যা-সংক্রান্ত নানা বিষয় অনুসন্ধান করিয়া আরবেরা পুরাকালীন জ্যোতির্ব্বিৎদিগের ঐসকল বিষয়ে ভ্রমসঙ্কুল মত সকল সংশোধন করিয়াছিল। পারস্য দেশের জ্যোতির্ব্বেত্তারা জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ এই যে তাঁহারা পুরাকালীন পঞ্জিকার নানা রূপ ভ্রম সংশোধন করিয়া তাহার পুনঃ-সংস্কার করেন। ইউরোপীয়েরা ইহার পাঁচ শতাব্দী পরে আপনাদিগের পুরাতন পঞ্জিকা সংশোধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আরবেরাই সময় নিরূপণ করিবার জন্য দোলযন্ত্র সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্টি করে এবং তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের সাম্রাজ্যে গ্রহনক্ষত্রাদি নিরীক্ষণার্থ মানমন্দির সকল নির্ম্মাণ করে। যন্ত্রতত্ত্ব ও জলতত্ত্ব এই দুইটি বিজ্ঞানের আরবেরা বিশেষ উন্নতি সাধন করে। পদার্থ সকল জলের উপরি ভাগে কেন ভাসে ও কেনই বা ডুবে ইহারা এতৎ বিষয়ক কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিল, এবং নিউটন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম-নিষ্ঠ সামান্য জ্ঞানও লাভ করিয়াছিল। গ্রীসের দৃষ্টিবিজ্ঞানবিদেরা বলিতেন চক্ষু হইতে রশ্মি দৃষ্ট পদার্থে গিয়া লাগে, আরবেরা ঐ ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক দৃষ্ট পদার্থ হইতে রশ্মি নির্গত হইয়া চক্ষুতে আসিয়া লাগে এই সত্য প্রচার করিয়া দৃষ্টিবিজ্ঞানবিদ্যাকে স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপনা করে। আলহাজেন নামক কোন আরব বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, আলোক আকাশের মধ্য দিয়া ঋজুরেখায় না আসিয়া বক্রগতিতে আসিয়া থাকে এবং তজ্জন্য আমরা সূর্য্য ও চন্দ্রকে উদয়ের অগ্রে ও অস্তের পরেও কিয়ৎকাল দেখিতে পাই। আরবেরা রসায়ন বিদ্যার জন্মদাতা। তাহারাই প্রথমে রসায়ন বিদ্যার বিশেষ আলোচনা আরম্ভ করে। আরবেরা নানা রাসায়নিক সত্য ও নূতন রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত করিয়া ইহার বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া যায়। তাহারা ক্ষার ও অম্ল পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ ও দ্রাবক ও ক্ষারজান অম্ল এবং সুরাসারের আবিষ্ক্রিয়া করে। এই রূপ সকল বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চা ও উন্নতি হওয়াতে ভৈষজ্য বিদ্যা ক্রমে ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে রীতিমত ভৈষজ্য বিদ্যার আলোচনা ও শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং ঐ বিদ্যায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া অনেকে বিচক্ষণ চিকিৎসক হইয়া

ছিল। চিকিৎসা বিদ্যার পরীক্ষা-রীতি তখন ইউরোপ খণ্ডে প্রচলিত ছিল না। বোগদাদ নগরেই প্রায় আটশত আটজন পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রশংসা-পত্র-প্রাপ্ত আরব চিকিৎসক ছিলেন। এই আরব চিকিৎসকেরা আপনাদিগের কার্য্যে যে অতি নিপুণ ছিলেন তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে দক্ষিণ ইউরোপের গর্ব্বিত ও পক্ষপাতী রাজগণ ঐ সকল চিকিৎসকের বিশেষ সমাদর করিতেন এবং তাঁহাদিগকে স্ব স্ব চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন।

ক্রমশঃ

কলিকাল।

(বিষ্ণুপুরাণ হইতে অনুবাদিত)

আমরা ভবিষ্যৎ ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে তাহা বলিবার অলৌকিক ক্ষমতাতে বিশ্বাস করি না কিন্তু এক জন দূরদর্শী ঋষি স্বীয় বুদ্ধিবলে বহুকাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজের একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাহা প্রকাশ করিলাম।

ব্রহ্মন্! কলিযুগে মানবগণের প্রবৃত্তি ও আচার ব্যবহার বর্ণের অনুরূপ ও আশ্রমের অনুরূপ হইবে না। মনুষ্যেরা বেদবিধি অনুসারে ক্রিয়াকাণ্ড করিবে না। ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ্য প্রভৃতি আট প্রকার বিবাহের মধ্যে যে বিবাহ যাহার পক্ষে ধর্ম্মানুমোদিত সে তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না। গুরু, শিষ্যের প্রতি ও শিষ্য,গুরুর প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিবেন না। দম্পতির যেরূপ ব্যবহার আবশ্যক তাহার অন্যথা ঘটিবে। দেব-ভক্তিতে যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান রহিত হইয়া যাইবে। বলবান ব্যক্তি নীচ কুলে জন্মিলেও সকলের অধীশ্বর হইবে। জাতি-নিরপেক্ষ হইয়া বিবাহ প্রচলিত হইবে। কলির ব্রাহ্মণ যথারীতি দীক্ষিত হউন বা না হউন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। প্রায়শ্চিত্ত কেবল লোকরঞ্জনার্থ অনুষ্ঠিত হইবে। তৎকালে মনুষ্যের যে কোন বাক্যই শাস্ত্র, মনঃকল্পিত দেবতার সৃষ্টি ও ইচ্ছানুরূপ আশ্রমের সৃষ্টি হইবে। মনুষ্যেরা অল্পমাত্র ধনে গর্ব্বিত হইয়া উঠিবে। স্ত্রীলোকের কেশমাত্রেই রূপগর্ব্ব উপস্থিত হইবে। সুবর্ণ মণি রত্ন ও বস্ত্র প্রভ্রতি কিছুই সুলভ থাকিবে না। রমণীগণ কেবল কেশেই আপনাদিগকে সুবেশ মনে করিবে। নির্ধন স্বামী উহাদের ত্যজ্য এবং ধনবানই উহাদের গ্রাহ্য হইবে। যে ব্যক্তি দানশৌণ্ড সেই সকলের প্রভু হইবে। কৌলিন্য নিবন্ধন প্রভুত্ব লুপ্ত হইয়া যাইবে। মনুষ্যেরা গৃহাদি নির্ম্মাণকেই ধন সঞ্চয় মনে করিবে। সকলেই অর্থোপার্জ্জনে ব্যগ্র, জ্ঞানোপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইবে। সঞ্চিত অর্থ নিজের ভোগেই পর্য্যবসিত হইবে। স্ত্রীজাতি রমণীয় বস্তুতে স্পৃহাবতী ও স্বেচ্ছাচারিণী হইবে। তৎকালে অন্যায়ত উপার্জ্জন করিতে সকলেই লোলুপ হইবে এবং সুহৃদের প্রার্থনাতেও কেহ স্বার্থহানি করিবে না। শূদ্রাদির এরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইবে যে, পুরুষত্বে আমি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ন্যূন নহি তবে আমার সহিত তাঁহার ইতর বিশেষ কি? দুগ্ধের পরিমাণ অনুসারে গোগণের প্রতি গৌরব বৃদ্ধি হইবে। তৎকালে প্রায়ই অনাবৃষ্টি, প্রজারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জলবিন্দু প্রত্যাশায় সতৃষ্ণ নয়নে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। এই অনাবৃষ্টি-জনিত দুঃখে কাতর হইয়া লোকে ফল মূল পত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। অধিকাংশই ধনহীন হইয়া দুর্ভিক্ষে ক্লেশ ভোগ করিবে। আমোদ প্রমোদ লুপ্ত হইয়া যাইবে। লোকে অস্নাত হইয়া আহার করিবে এবং অতিথিসৎকার ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি

রহিত হইবে। রমণী লুব্ধস্বভাবা উদর-পরায়ণা বহুপ্রসবা ও দুর্ভগা হইবে। তাহারা উভয় হস্তে মস্তক কণ্ডূয়ন পূর্ব্বক গুরুজন ও স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, আহার ও পরিচ্ছদেই তাহাদের অভিরুচি হইবে, দেহ ক্ষুদ্র ও সংস্কারহীন হইবে। নিষ্ঠুর ও মিথ্যা বাক্যে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। তাহারা স্বয়ং দুঃশীলা এবং দুঃশীল পুরুষেও তাহাদের অনুরাগ জন্মিবে। কুলকামিনীরা অসৎ-চরিত্রা হইয়া পুরুষের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিতে থাকিবে। ব্রত নিয়মাদি-রহিত ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন করিবে। দানের পাত্রাপাত্র-বিচার থাকিবে না। যাহারা বানপ্রস্থ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসী তাহারা পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত মিত্রাদি সম্বন্ধে বদ্ধ হইবে।

রাজগণ প্রজাপালন না করিয়াও শুল্কছলে প্রজাদের ও বণিকগণের ধন হরণ করিবে। যে ব্যক্তির বহু পরিমাণে হস্ত্যশ্ব রথ থাকিবে সেই রাজা হইবে। দুর্ব্বলেরা ধনবানের ভৃত্য হইয়া থাকিবে। বৈশ্যেরা স্বকার্য্য কৃষি বাণিজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কারুকর্ম্ম ও সেবা দ্বারা জীবিকা সংস্থান করিবে। সংস্কারহীন শূদ্রগণ প্রব্রজ্যা-চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক পাষণ্ড-বৃত্তি ভিক্ষা আশ্রয় করিবে। প্রজারা দুর্ভিক্ষ ও রাজকরে পীড়িত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে কদন্ন-ভূমিষ্ঠ দেশ আশ্রয় করিবে। বেদ-বিধি বিলুপ্ত, জনসমাজ পাষণ্ড লোকে পূর্ণ হইবে এবং অধর্ম্ম-বৃদ্ধি হেতু সকলে অল্পায়ুঃ হইয়া উঠিবে। স্ত্রী পুরুষের অতি অল্পবয়সেই সন্তান জন্মিবে। অল্পের মধ্যেই লোকের বার্দ্ধক্য, অল্পকালই লোক জীবিত থাকিবে। যে যে সময়ে পাষণ্ডদলের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা যায় সেই সেই সময়কেই কলিকাল বলিয়া অনুমান করিয়া লইতে হইবে। যে সময়ে বেদমার্গানুসারী সাধুগণের হানি দৃষ্ট হয় এবং যে সময়ে ধার্ম্মিক লোকের কার্য্য অবসন্ন হইয়া আইসে সেই সময়েই কলির প্রাধান্য বুঝিতে হইবে। যে সময় লোকে পুরুষোত্তম বিষ্ণুর আরাধনায় ঔদাস্য করে সেই সময় বুঝিতে হইবে কলি প্রবল। যে সময় বেদবাক্যে অপ্রীতি এবং পাষণ্ডী পথে প্রীতি পণ্ডিতেরা অনুমান করেন সেই সময়েই কলির বৃদ্ধি। তৎকালে লোকে নাস্তিকদিগের প্রবর্ত্তনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরকে অর্চনা করিবে না এবং এই রূপ কহিয়া বেড়াইবে যে বেদে আবশ্যক কি, ব্রাহ্মণে প্রয়োজন কি, দেবতা কি জন্য পূজ্য এবং জল দ্বারা দেহশুদ্ধিরই বা ফল কি? কলিকালে প্রায়ই অনাবৃষ্টি হইবে। অল্প-ফল শস্য এবং ফল স্বাদহীন ও অসার হইবে। কলিকালের বস্ত্র সকল সূক্ষ্ম এবং বৃক্ষ নিষ্ফল হইবে। সমস্ত বর্ণ শূদ্রবৎ ব্যবহারে রত হইবে। ধান্য অণুমাত্র এবং ধেনুর অভাবে ছাগদুগ্ধেরই ব্যবহার হইবে। কলিকালে গুরুর মধ্যে কেবল শ্বশ্রু ও শ্বশুর। যাহার ভার্য্যা সুন্দরী সে, এবং শ্যালক পরম মিত্র হইবে। তৎকালে সকলই শ্বশুরের অনুগত হইয়া বলিবে পুরুষ যখন কর্ম্মাধীন তখন কে কাহার মাতা এবং কেই বা কাহার পিতা। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা বারংবার কায়িক বাচিক ও মানসিক দোষে অভিভূত হইয়া দিন দিন পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। সকলে স্বত্বহীন অশুচি ও শ্রীভ্রষ্ট, যে যে কার্য্য দুঃখজনক তাহাই ঘটিতে থাকিবে। ব্রাহ্মন্! এই রূপ যখন বেদাধ্যয়ন ও যাগ যজ্ঞ রহিত হইবে তখন কোন এক পবিত্র স্থানে অল্প সংখ্য লোক বাস করিবে। সত্যযুগে তপস্যা দ্বারা যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় হইত ঐ স্থানে অল্প যত্নে সেই রূপ উৎকৃষ্ট পুণ্য সঞ্চয় হইবে।

এতদ্দেশীয় কৃষক ও ধর্ম্মনীতি।

মনুষ্যের মৃগয়া প্রথম অবস্থা পরে পাশুপাল্য। যখন কাহারও জ্ঞান ও বুদ্ধি বিকশিত হয় নাই,ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তি কেহই জানিতে পারে নাই তখন কেবল পশুমাংস ও পশুদুগ্ধই সকলের জীবিকা ছিল। ক্রমে যখন বন্যপশু অসুলভ হইল, মনুষ্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, এবং সকলের অভাববোধ উপস্থিত হইল তখনই কৃষি ও কৃষকদলের উৎপত্তি হয়। ফলত অভাবই ইহার প্রসূতি। কিন্তু তৎকালে সকলেই যে কৃষক ছিল এরূপ বোধ হয় না, এই কৃষকদলের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ কর্ম্মার (১) প্রভৃতি আর কতকগুলি শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহারা বিনিময়ে পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করিত। এই কৃষকদল হইতে মনুষ্যের পশু-হিংসা-জনিত রুক্ষভাব বিলুপ্ত, উদ্ভিদের স্নিগ্ধতা ও শান্তি প্রত্যেকের অস্থিতে অস্থিতে সঞ্চরিত এবং মনুষ্য-সমাজে ভাবী উন্নতির শিশু-দোলা বিনির্ম্মিত হয়।

বহুপূর্ব্বে এতদ্দেশে ভূমির উপর কৃষকেরই নির্ব্যূঢ় স্বত্ব ছিল। ব্যবস্থাপক মনু কহেন,(২) যে,যে ব্যক্তি মৃগকে শরবিদ্ধ করিয়া বধ করে মৃগ যেমন তাহারই সেইরূপ যে ব্যক্তি ভূমির জঙ্গল পরিস্কার করিয়া হলকর্ষণ ও বীজ বপন করে ভূমি তাহারই। যখন শাসনের অনুরোধে রাজার সৃষ্টি হইল তখনও কৃষকদিগের অধিকার অখণ্ডিত ছিল। রাজা সাধারণের রক্ষক, তিনি এই রক্ষার ব্যয়-ভার বহন করিবার জন্য কৃষকদিগের নিকট আয়ের ষষ্ঠাংশমাত্র লইতেন। এই ষষ্ঠাংশ সংগ্রহ করিবার জন্য রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী এক এক জন মণ্ডলাধিপতি থাকিত। রাজা আবার এই অর্থ প্রজাদিগেরই সুখবৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাক্রমে ব্যয় করিতেন। এইটি এতদ্দেশের পূর্ব্বতন নিয়ম। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হয়, ভূমির স্থায়ী অধিকার কৃষকেরা বহু দিন নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিয়াছিল এবং সুখী ছিল। পরে যখন দুর্জ্জয় মোগল সম্রাটেরা আসিয়া পুণ্যভূমি ভারতের বক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল, যখন হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দু আচার ও হিন্দু ধর্ম্মকে ইহারা বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, তখনও কৃষকদিগের পক্ষে পূর্ব্ব-প্রথার তাদৃশ পরিবর্ত্ত হয় নাই। উহারা কিছু কিছু কর দিয়া ভূমি অধিকার করিয়া থাকিত; কিন্তু মোগল জাতি অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়, উহারা ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত এবং বীর্য্যগর্ব্বে স্ফীত হইয়া সুরা অপ্সরা লইয়া কালক্ষেপ করিত। এই সুযোগে উহাদের অধিকারে নিযুক্ত মণ্ডলাধিপতিরাও যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহারাই পরিশেষে এ দেশের জমিদার হইয়া উঠে। ঐ সময় কৃষকদিগের হাহাকার, উহাদের করুণ কণ্ঠধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহার অশ্রুজলে আর কাহার হৃদয় আর্দ্র হইবে।

পরে ব্রিটিস-সিংহের অধিকার। মোগল সাম্রাজ্যের অত্যাচার এক প্রকার বিলুপ্ত হইল, কিন্তু এসময়েও কৃষকেরা তাদৃশ সুখী নয়। ভূমির উপর ইহাদের নামমাত্র স্বত্ব আছে বটে কিন্তু ইহারা নানা প্রকার কর-ভারে নিতান্ত নিপীড়িত। ইহাদের অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছে। হয়ত এক ব্যক্তি ভূমিতে শস্যোৎপাদন করিবার জন্য বিলক্ষণ কষ্ট সহ্য করিল, শ্রাবণের মুষলধারে বৃষ্টি তাহার মস্তকের উপর দিয়া গেল, ঝঞ্ঝাবাত শিলাপাত সহ্য করিল, পশু পক্ষী ও মনুষ্যের উৎপাত দূর করিল, এই সমস্ত করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ

---

(১) ঋগ্বেদে কর্ম্মার শব্দটী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার অপভ্রংশ কামার।

(২) স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগং। মনু

উদারান্ন সঞ্চিত হইল, কিন্তু এক দিন হয়ত রাজকর প্রদানে অসমর্থ হইয়াছে, তাহার সঞ্চিত অন্ন রাজপুরুষেরা আসিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া গেল। ফলত ইহারা এখন অসুখী।

আর একটি কথা, পূর্ব্বকালে এই কৃষকের সহিত উচ্চ শ্রেণীর একটী বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। কোন ভদ্রবংশীয় সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ পারিষদ্গোষ্ঠীতে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে এক জন কৃষক উপস্থিত, বৃদ্ধ তাহাকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত স্বপার্শ্বে আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। হয় ত সেই কৃষকের সহিত কোন একটি পবিত্র কল্পিত সম্পর্ক আছে, তিনি সেই সম্পর্কের অনুরূপ সম্বোধনে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। কখন পারিষদ-গোষ্ঠীতে রাম যুধিষ্ঠিরাদির চরিত্র লইয়া আন্দোলন হইতেছে, কৃষক আনন্দ ও উংসাহের সহিত তাহাতে যোগ দিত, কখন উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মসমস্যা উঠিতেছে কৃষক স্থির কর্ণে তাহা শুনিত, কখন বা বৈষয়িক জটিল তর্ক উত্থিত হইতেছে কৃষক সকলের সঙ্গে একটী স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইত, কখন বা কৃষি-কার্য্যের কোন নিগূঢ় কথা উপস্থিত, কৃষক তন্ন তন্ন করিয়া সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইত। এতদ্ব্যতীত কৃষক পত্নী ও তাহার অন্যান্য পরিজন ঐ সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধের অন্তঃপুরে অত্যন্ত সমাদৃত এবং নানা প্রকার সম্বন্ধে আহত।

পূর্ব্বতন এই রূপ ব্যবহারে জনসমাজে কএকটী বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইত। প্রথমত নিম্ন-শ্রেণীতে বহুল পরিমাণে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রচার, দ্বিতীয়ত সংশ্রবাধীন পরস্পরের স্নেহ মমতার বৃদ্ধি, তৃতীয়ত সম্পর্ক-সূত্রে পরস্পরের পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষা, চতুর্থত ভদ্রসমাজে কৃষি-বিদ্যার চর্চ্চা। কিন্তু এক্ষণে শিক্ষিত দল কৃষিকার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া আছেন। ইহাঁরা ইংরাজী-শিক্ষা-প্রভাবে স্বার্থপর ও আড়ম্বরপ্রিয় হইয়াছেন। পুণ্য অপেক্ষা যশই অধিক পরিমাণে ইহাঁদের কার্য্য নিয়মিত করে। কৃষকশ্রেণীর প্রতি ইহাঁদের প্রকৃত স্নেহ ও মমত্ব নাই, স্পষ্ট কথায় বলিতে কি, ইহাঁদের ভিতর ফোঁকরা, তজ্জন্যই অধিক হাঁক ডাক। “সাধারণ হিত সাধারণ হিত” বলিয়া সর্ব্বত্র ধুম ধাম করিয়া বেড়ান, কৃষকের পক্ষ-সমর্থনার্থ গগনস্পর্শী স্বরে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলেন, পার্লেমেণ্টে আবেদন পাঠান কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র কৃষককে একমুষ্টি অন্ন দেন না, তাহাদের সঙ্গে বশিতে লজ্জা বোধ করেন, বাক্যালাপে মানহানির আশঙ্কা করেন। কিন্তু ইহা একটী নিগূঢ় কথা—মনুষ্য স্বভাবের নিগূঢ়তম তত্ত্ব, যে, যেখানে পরস্পর সম্মান নাই সেখানে প্রীতির অভাব, আর যেখানে পরস্পর সম্মান আছে সেখানে অবশ্যই প্রীতি থাকিবে। সম্মানশূন্য প্রীতি হয় কপটতা নয় কেবল কথার কথা মাত্র। গুণবোধই প্রীতির কারণ, গুণবোধ হইলে সম্মানের ভাব অবশ্যই আসিবে। যাঁহারা কৃষককে হৃদয়ে ঘৃণা করেন এবং মুখে ভালবাসি বলেন আমরা তাঁহাদের সেই ভালবাসায় সন্দেহ করি এবং এই মৌখিক প্রীতি যে তাঁহাদের কোন নিগূঢ় সংকল্প সিদ্ধ করিবার ব্রহ্মাস্ত্র তাহাতেও বিশ্বাস করি।

এক্ষণে পরস্পরের এই অপ্রীতির একটী বিষময় ফল ফলিতেছে। কৃষকেরা আর ভদ্রলোককে প্রীতির চক্ষে দেখে না, এবং তাঁহাদিগকে আর তাদৃশ সম্মানও করে না। সংশ্রব দূরে থাক, ভদ্রের নামে কর্ণে হস্তার্পণ করে। এই সংশ্রবের অভাব ইহাদিগকে পানদোষে লিপ্ত করিয়াছে এবং শিষ্টাচারবিহীন করিতেছে। পূর্ব্বে ইহাদের কোন একটি দায় উপস্থিত হইলে ভদ্রলোকে

তাহা মিটাইয়া দিতেন, কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। বিচারালয়ের ভীম ভাব আর ইহাদের গতিরোধে সমর্থ নহে। এদিকে ভদ্রেরাও মনে করিতেছেন আমরা উপেক্ষিত হইলাম। সুতরাং ইহাঁদেরও নির্য্যাতনস্পৃহা বলবতী হইয়াছে, ইহাঁরা অনুদার হইতেছেন, পরহিতে হতযত্ন, অধিকতর নিষ্ঠুর ও কর্কশ হইতেছেন। যখন নিম্ন-শ্রেণীর সহিত বিশেষ সংস্রব নাই তখন ত ইহাঁরা দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থায় একপ্রকার অনভিজ্ঞ এবং তন্নিবন্ধন ক্রমশঃ সমাজ-শাসনেরও অযোগ্য হইয়া উঠিতেছেন। ইহাঁরা সমাজ-শাসনে অক্ষম, নিম্ন-শ্রেণীও অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল এজন্য রাজ-শাসন-প্রণালীও ক্রমশঃ কঠিন হইতেছে। দেশের উচ্চ লোক যদি অধস্তনদিগকে স্নেহ ও প্রীতিতে শাসন করিতে পারেন তাহা হইলে রাজা কি জন্য উগ্রভাব ধারণ করিবেন। এখনকার পুলিশের যে বেশি আঁটা আঁটি এবং অধিকতর ফৌজদরি আদালতের সৃষ্টি তাহারও কারণ বোধ হয় এইটী।

আর একটী কথা। হৃদয়ের অনুদারতা সমাজের বিশেষ অনিষ্টজনক হইয়া থাকে। আমরা স্বজাতীয়দিগকে ঘৃণা করিয়া কত যে হারাইব বলিতে পারি না।

উপসংহারে ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনকে কিছু বলা আবশ্যক। ইহার সভ্যেরা কৃষকদিগের স্বত্ব রক্ষার্থ প্রথমে বদ্ধপরিকর হন। এখন তাঁহাদের সে উদ্যম ও চেষ্টা নাই। আমরা বলি তাঁহাদের সে উদ্যম ও চেষ্টা থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে উদ্যম ও চেষ্টার সফলতার জন্য কৃষক-শ্রেণীর সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, তাহাদিগকে প্রকৃত স্নেহ ও সদ্ভাব দেখাইতে হইবে, তাহাদিগকে আপনার পরিবারতুল্য বিবেচনা করিতে হইবে, তাহাদিগকে আপনার দেহ ও রক্ত বিবেচনা করিয়া তাদের ব্যথায় ব্যথী হইতে হইবে। নচেৎ তাহাদের পক্ষ হইয়া সহস্র আন্দোলন করুন, সহস্র আবেদন করুন, সহস্র উপকার করুন, কোন ফলোদয় হইবে না। কৃষকশ্রেণী নিরক্ষর, এই উপকার-সমষ্টি কাহার হস্ত হইতে আসিতেছে কিছুই বুঝে না, সুতরাং যে অসদ্ভাব সেই অসদ্ভাবই থাকিয়া যাইবে।

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত।)

৪১৯ সংখ্যক পত্রিকার ৫২ পৃষ্ঠার পর।

১০৩

সাহসপূর্ব্বক ঈশ্বরের দিকে চক্ষু উত্তোলন কর এবং বল যে ভবিষ্যতে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাতেই আমাকে নিয়োগ কর। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা; সকল বস্তুর প্রতি উদাসীন হইয়া তোমার সহিত একমন হইতেছি। যাহা তুমি ভাল বিবেচনা কর তাহা আমি কখন অস্বীকার করিব না, যেখানে তোমার ইচ্ছা সেইখানে আমাকে লইয়া যাও। লোক-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কিম্বা তদ্বিপরীত ধনাঢ্য কি ভিক্ষুক, যাহা তুমি হইতে বল তাহা হইতে আমি প্রস্তুত আছি। এই সকল কার্য্য জন্য লোকসমীপে তোমার পক্ষ-সমর্থন করিব এবং কেন এইরূপ বিধান করিলে তাহার কারণ প্রদর্শন করিব।

এপিকৃটিটস্

১০৪

(বন্ধুর প্রতি উক্ত)

কি ক্ষুদ্র কি গুরুতর বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক তোমাকে স্বাধীন ও অক্ষুণ্ণ-চিত্ত করিবার আমার অভিপ্রায়।

ঐ

১০৫

কেবল ঈশ্বরের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি না রাখিলে, ঈশ্বরপরায়ণ না হইলে, কেবল ঈশ্বরের আদেশ পালন না করিলে শোক, ভয়, কাম, ঈর্ষা প্রভৃতিকে দূর করিতে পারা যায় না।

ঐ

১০৬

আমাদিগের দুই প্রকার সম্বন্ধ আছে; যাহাদের সঙ্গে বাস করি তাহাদিগের সঙ্গে সম্বন্ধ এবং যে জগৎ-কারণ দ্বারা সকল ঘটনার বিধান হইতেছে তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ।

এণ্টোনাইনস্

১০৭

ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট ও আহ্লাদিত চিত্তে সাধারণ মঙ্গলজনক কার্য্য ক্রমাগত করিবে।

ঐ

১০৮

আমি জগৎ-নিয়ন্তার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর করিতেছি।

ঐ

১০৯

যদি আমাদিগের বুদ্ধি থাকিত তাহা হইলে প্রকাশ্যরূপে এবং গোপন ভাবে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতাম, তাঁহার স্বস্তিবাচন করিতাম এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতাম। যাহারা ভূমি খনন করে, হলযন্ত্র চালনা করে, এবং ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহাদিগের এই প্রকারে ঈশ্বরের নিয়ত গুণ গান করা কি উচিত নহে? "ধন্য ঈশ্বর যিনি ক্ষেত্রকর্ষণ করিবার নিমিত্ত এই সকল ইন্দ্রিয় আমাকে প্রদান করিয়াছেন। ধন্য ঈশ্বর যিনি আমাদিগকে হস্ত প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন, যিনি আমাদিগের শরীর ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করিতেছেন, যিনি নিদ্রা-সময়ে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সক্ষম করিয়াছেন।" কিন্তু এই সকল বিষয়ে (অর্থাৎ তাঁহার করুণার এই সকল কার্য্য) আমরা বুঝিতে পারি বলিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করা সকল গুণানুবাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যখন অধিকাংশ মনুষ্য মোহান্ধ তখন এই কার্য্য কি এক জনের নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত নহে যে তিনি সকলের হইয়া ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন করেন? যদি আমি কোকিল হইতাম, কোকিলের কাজ করিতাম, যদি হংস হইতাম, হংসের কাজ করিতাম, যখন আমি বুদ্ধিমান জীব হইয়াছি তখন আমার কর্ত্তব্য যে উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের গুণ গান করি ও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করি।

ঐ

ক্রমশঃ

রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও তল্লাভের বিশিষ্ট উপায়।

পারিস নগর প্রবাসী কোন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনশীল শ্রেষ্ঠকুলোদ্ভব হিন্দুযুবক সম্প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি মহাশয়কে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন ও সেই পত্র-সম্বলিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভারতবর্ষীয়দিগের দ্বারা তল্লাভের বিশিষ্ট উপায় বিষয়ে একটি যুক্তিযুক্ত অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা উভয় পত্র ও প্রবন্ধ অত্যন্ত আদরের সহিত নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

Paris, June 21, 1878.

DEAR SIR,

The enclosed was commenced and the greater part of it written in the beginning of February. Pressure of my regular studies rendered it impossible to finish what I have begun and it was laid quite aside. In the meantime some of my dark apprehensions have been realised. The Vernacular Press Act has been passed. Thinking that such

outspoken thoughts might be of some service to our countrymen in the existing circumstances, I have in spite of excessive pressure of work, brought what I had to say, to a close and I hasten to send it to your address.

* * * *

* * * *

The more I know of our old Hindu life, the more I learn to love and respect it—the more I appreciate the feeling with which you once so eloquently pleaded for the "*Hindu Name*" in the sequel of your Lecture: "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা." "We cannot—dare not give it up.—it is to unite us All once more" you so justly said. And those who know what our old Hindu life once was—who do all they can to know more and see the immeasurable bearings of that knowledge on the development of the future Hindu nationality in India—should all the more draw close to each other—should unite themselves in the bonds of brotherly sympathy and fellow ship. We are all working to the same noble cause. Unity should give us also here as everywhere else more efficiency—should greatly accelerate our progress.

* * * * *

* * * * *

How the enclosed ought to be published I leave it entirely to you to decide.

* * * *

As for my studies I am now engaged in a work on our great Hindi Poet Chand, but the work is not likely to be done until some time to come! Chand was a very great poet and yet so little known in Bengal. * * The new Brahmo movement interests me greatly but its anti-Hindu spirit I can not quite approve of. * *

I remain,
Sir,
Respectfully your's,
* *

POLITICAL LIBERTY AND THE BEST MEANS FOR ITS ATTAINMENT BY THE NATIVES OF INDIA.

From the few quotations which the Calcutta Correspondent of the "Times" lately made from some native journals, it is easy to see that there is at least aspirit of bold speculation amongst the educated natives of India. They seem already to have caught at least partially that spirit of independence which is such a characteristic of all European nations, especially of the Teutonic races. India, even in the days of her glorious Past, has been said by no less an authority than Professor Max Muller to have not been particularly prominent in this feeling—political interests were alien to a people who directed all their energies to the problems of Life and Death or to those which concern Man's relation to "The All" as the Vedantic Rishis would express it. It is therefore a very hopeful sign, a feeling which it is impossible to notice without sincere delight, that India is also taking into herself a spirit of political liberty and if it be laid at the door of England that she has done nothing but impoverished India, this creating as it were a new element in the Indian national life must at least be recorded in her favour. Granted that England's monarchy in India has verily been that which Mr. Bright in his late Manchester speech attributed to her, granted that all the rhetorical epithets which that eloquent statesman applied were subject to no qualification, has not England at least done this one thing for India which the Mahometans, not to say anything of the Greeks, were incapable of doing in their sway of 1000 years; And how long is it that England reigns in India? A century—no more. Nay, her proper reign might be said to have begun only since half-a-century. Is not that at least an auspicious beginning?

But however one might congratulate India and her young patriots on their growing feeling of national independence——however one might sympathise with their just and laudable enthusiasm for the rights of their country, there is nevertheless a different side of this matter which it is essential to bring home to them. National liberty is an object which every individual is bound to strive after and fight for. But there are certain conditions which we regard as essential—inevitable to its realisation. And therefore the question of the most essential importance is: Are the modern Patriots of India endeavouring to fulfil those conditions or are they venting their patriotism merely in dithyrambs and sonnets to Liberty—in patriotic associations or in such sensational journalistic productions as those extracts from which have been alluded to in the beginning ? Do the modern Patriots of India really think that they should be able to do much in the way of their national independence merely by such literary efforts, unless the latter be at the same time accompanied by those practical means which it is the real object of the former to give an impulse to ? Not that we do not know how to value earnestness of soul. It has its great value but what we contend for and we simply repeat what we have said above that there are certain inevitable conditions, which alone entitle a nation to political independence or endow it with the *might*, and hence with the *right*, of governing itself. It is necessary to be clearer. Our studies in History and its cognate branches have gradually brought us to the conviction that the Law of Natural Selection whose action is so fearfully prominent in the vegetable and animal worlds obtains equally in human society with scarcely any perceptible modification. And we all know what that Law means. It means that only the fittest deserve to, and will, survive, and, by the fittest, nature seems to mean in the first place the strongest in body and soul. She seems to abhor the weak and the imbecile no less than the fancied vacuum of old and her proceeding with them is one of total annihilation or of merited degradation to the position they should justly occupy. Only he dares speak of right or rights who has might, exclaims she in her Book of Revelations which we term History. And if man—foolish man, misled either by metaphysical subtleties or theological fancies, misreads that Book,—refuses to listen to Nature's solemn audible voice across the dust of empires and the din of centuries, oh ! then she knows well enough how to flog her truant child back to his proper senses, and her admonitions are not quite those of a caressing Bengali mother, but consist as we all know in fearful convulsive revolutions until Rome finds her Caesar, England her Cromwell and France her Napoleon (not of course "Le Petit"). In these Nature once more asserts her eternal law—once more gives the Hero who reigns not by the so-called right of conventional inheritance but of *might* which alone gives you the right ! The imbeciles and weak-lings or worse still the sham-heroes who brought the nation to its miserable plight have been scattered to the winds by her vocanic force—the almost inundating lava-streams of the people's blood have now been stemmed, and look how the nation blooms and flourishes once more under the sway of its just rightful King, because chosen by Nature on account of his acknowledged might and therefore his inviolable right to rule. (See the very well-known works: (1) Mommsen's "Geschichte Roms," (2) Carlyle's "Cromwell's Letters and Speeches" and (3) "Thier's Histoire du Consulat"). And what the great philosophical historians we have just named have so conclusively proved by an immense mass of facts and the rare force of their logical powers in the case of individual men, holds equally good in the case of individual nations whose community forms the human race. Here also, it is the most heroic that should reign—the wisest and the strongest that should rule, and abundant blessings flow to the conquered in spite of the bloody resistance they might offer, or curses and imprecations they might heap on their hated conquerrors. Read only what David Hume says on the effects of the Roman Conquest in Britain and if you will appeal to the facts of Universal History (Wellgeschichte) you will be convinced that similar effects have taken place in all countries and in all climes—all the more in proportion to the higher civilisation of the conquering and the *wise teachableness* of the conquered. Nay, History proves more. It proves that even if the conquering race occupy an inferior scale of civilisation—even if it be destitute of those arts and sciences which are generally recognised as the inevitable concomitants of a civilised life and have no other qualities to recommend itself but manly courage, abounding energy and undisguised frankness, its hammering down the tottering remnants of a highly civilised but exceedingly corrupt nation is of rare service to humanity as a whole. It is hardly necessary to allude to those whom we mean. We mean of course the Franks, the Goths and the Vandals: those "barbarians of the North" who battered down the effete civilisation of the Roman Empire. If the all sweeping, all-devastating Mongolic hordes had not once, under their well-known leaders, over-spread locust-like all the countries lying between Pekin and Moscow, Punjab and

Silesia, we should have been deprived of those exemplary Mogul rulers whose great memories we must cherish with perpetual gratitude and who conferred blessings of civilisation on our land which every street, nay every mouldering stone of Delhi, Agra and Lucknow still bears a magnificent and no less a touching witness of. We mean of course *our* Baber, *our* Akbar (Glory to his name—perhaps the very *beau-ideal* of a Ruler and hence also of a man that has ever lived !) and *our* Shahjehan—rulers in whose presence we feel as if we were before our Rama, Vikramaditya and Chandragupta !

If such be then the verdict of Universal History—if such be Nature's inexorable Law, it is meet that we, the Hindus, should recognise it in due time and try to wrest out of Fate all the good she is able to yield. And if without allowing ourselves to be hurried away by the impetuosity of a blind patriotism which we are afraid has begun to infect the rising generation of India, we should calmly and thoughtfully weigh the facts as they are, we should go out with the conviction, that for India, no other foreign conquest could be more favorable—more suited to supply her with all that she most needs than that of England. And what is it that our country stands most in need of ? Certainly : (1) Industry (2) Commerce (3) Political Spirit and above all (4.) The Physical Sciences. These, we say are the crying needs of India, needs which must be met with or we must perish most miserably—like Peru or Mexico. And those who have taken most pains to study what India once was, and what a hotbed of famine, pestilence, ignorance, superstition, and of brutality she now is, shall accede most to this opinion, as for example that gifted nobleman who, with a discrimination proportionate to his good will, holds now the rudder of our government. In a speech which His Excellency delivered quite in the beginning of his gracious reign (it was, we believe before the Convocation of the Calcutta University) he observed that what India wanted was not *meta-physical philosophy* but *physical science*, for he strongly suspected that the Hindus might even excel the Europeans in the subtleties of their dialectical ingenuity ! (the words may not be quite exact, for we quote from memory). And what His Excellency said about dialectical skill, he might have said with still greater truth about Philology, Poetrv and Religion. How extremely valuable were the achievements of the ancient Hindus in all these branches of knowledge, is well-known to every European who is acquainted with the *chefs-d'oeuvre* of the eminent savants who began their work of enlightenment (ex oriente lux !) a century ago under Jones and Colebrooke and are now so worthily represented by men like Max Muller and Albrecht Weber. Though transferred from one political slavery to another, India has nevertheless continued to dominate over by far the greatest part of Asia by the rare vigour and the abundant richness of her spiritual life. And what the Hindu mind has been doing for long long centuries for China Japan, Thibet, Mongolia and Siberia, for Burmah, Siam and some of the islands of the neighbouring Archipelago, it has now begun to do for Europe, if we are to interpret it by the influence which it has already exercised on some of her most cultured minds and acknowledged leaders of thought. Max-Muller never speaks of our Language—of its influence on Philological Science—of our " divine" grammarian Panini but in words of rapturous enthusiasm and those who would measure the influence of our Poetical Literature on some of the greatest poets and poetical philosophers of Europe need only recollect the well-known eulogic words of Goethe, Schlegel, Ruckert and the Humboldts, not to forget at the sametime that noble Italian, Gorresio who, in his Introduction to the Ramayana, evinces such a rare kinship to our pious and poetical ancestors. Passing by the voluminous works of the Orientalists themselves like Burnouf, Stanislas Julien, Foucaux and others—of popular expounders like Köppen and St. Hilaire, the influence of Buddhism on the religious and philosophical thought of Europe which has but just begun is best gauged by referring to the works of one solitary thinker who, whether we agree with his opinions or not, is certainly exercising a vast influence not only on the rising generation of his own land but on the civilised world. We mean of course

Arthur Schopenhauer, whose pages abound with extracts from the Buddhist Literature and whose *Weltanschanung* seems to have been so considerably influenced by the teachings of the Prophet of Kapilavastu. Thus it is not Dialectics, nor Philology nor Poetry and Religion that we need; nay, as it would seem, we have enough of them not only for ourselves but even to spare a good deal for our neighbours. What then are our real and inevitable needs? Certainly that which Lord Lytton so wisely mooted in his Speech before the Convocation, namely: *Physical Science.* Yes, Physical Science is that which we verily want, and let us add also: Commerce, Industry and Political Spirit. Now, how could we be thrown into the contact of a nation worthier to supply us with all these? What other nation could boast of greater progress in Science, of more extensive and successful Commerce, of more efficient Industry and of freer Political Institutions more normally developed than England? What other nation, we ask, could count more universally acknowledged leaders of Science than Bacon, Newton, Darwin, (Charles), more successful representatives of Commerce than the Company which, beginning with small sea-coast factories, gradually established an empire greater than even that of Asoka or Akbar, more efficient leaders of Industry than Arkwright, Watt and Stephenson, and worthier heroes of Political Liberty than the Fathers of the Magna Charta down to their worthy successors: The Hampdens, the Pyms, the Elliots, the Miltons and the Sydneys of a later age? If such be our veritable needs and such the nation with which we have by a concourse of rare circumstances been brought into such intimate inextricable relations, what is it that we, the Hindus, should direct our efforts to do? Certainly to learn from our rulers and through them from the whole civilized world in a spirit of wise teachableness all that they have to teach us. And what England and Europe have to teach us is verily what we most lack of as has already been intimated. We should therefore do all we can to cultivate and master the Physical Sciences—make the most of those opportunities of acquiring them which have now been placed at our disposal. *In the first place* direct all our energies to be a *scientific* "nation" under the guidance of the master-minds of Europe and then we should have every thing else we want. The growth of Commerce and Industry shall go hand in hand with the growth of Science: they are twin-sisters—inseparable companions. And does not India of all countries in the world deserve it that her children should particularly occupy themselves with Science—should know the vast incomparable physical resources she possesses most that these might be developed and utilised as much as possible? What other country has ever been so proverbial on account of the fertility of its soil and the exuberance of its natural productions? What other country could boast of minerals, plants and animals more precious, more abundant and more diversified—of rivers wider and more navigable, mountains higher in altitude and richer in productions—coasts more extensive or more suited to the establishment of trading factories and efficient shipping? The material resources of our country, its fabulous richness, "the wealth of India" has been attracting foreign nations, either as merchants or invaders from time beyond mind. The first Mahometan conquerors measured away its gold and diamonds in *mauns* and not *in pieces.* We therefore owe it to our rarely gifted country to study the Physical Sciences, to know what physical resources she has, utilise them as much as possible and thus open the way to the highest development of our commercial and political interests. And in the broad day-light of scientific research shall pass away those gloomy spectres which now cause so much terror and agony to our now utterly wretched mind. Pestilence and Famine, Yellow Fever and Epidemic, with their attendant evils, shall pass away. No less shall those grim superstitions and ghastly usages pass away which are hardly less fatal in their consequences than the evils mentioned above. And if there be further any truth in the assertion made by almost all great Orientalists without exception that the Hindus have a mystical, unpractical tendency of mind, nothing is so likly, to care us of the same as a thorough acquaintance with the physical phenomena of Nature and the orders of sequence which they invariably follow. Thus Science—that which our present wise and beneficent Ruler has already proposed seems to be the chief remedy—yea—the panacea to say to all the frightful maladies which our dear country is so intensely suffering from. Following then his advice, let us direct our efforts to a thorough cultivation, and as much as possible to a wide diffusion of Science. It is Science—it is "Culture" in the German sense of that word that should now engage our best energies inorder that we may in due time reap its golden fruits which are: National Prosperity, National Liberty and, as the full mature outcome of all, a free, vigorous and noble National Literature. Do you think if we *deserve* Liberty, that is to say, if we have slowly but surely developed those conditions which alone entitle a nation to that grand golden privilege, England would be willing to withhold us from it? England—the land of free political institutions—the home of noble, heroic patriots? Then must she be untrue to the deepest, the holiest instincts of her soul—then must she be utterly faithless to the noblest of her traditions and the most cherished of her spiritual experiences. If she might indeed ever go down so low—if foregoing all that which makes her voice to-day so much respected in all countries—infuses such strong confidence in all nations fallen or about to fall, she might one day be so despicably corrupt—such a *blagueur* as the French say, oh! then should she be no more capable of holding us in bondage than the later Roman emperors their Asiatic Empire or the statesmen of George the Third's reign a century ago their noble heroic Puritanic brothers across the Atlantic? We should then assert our just rights in spite of all English Caesars and certainly with the living sympathy of the whole civilised world for us and its unmitigated execrations for them! Let us then in the first place do all we can—make use of all our present opportunities to *deserve* Liberty and we *will—must* have it. But if instead of trying to *deserve* Liberty by the adoption of those practical means which we have indicated above, we would permit ourselves to indulge in vituperative, scurrilous journalism or in seditious incendiary brochurism—in descanting with frothy, extravagant grand-eloquence on the supposed dotage and the consequent imbecility of England, we should only provoke our rulers—we should only tighten our chains—we should only deserve to be treated as all conquered and disloyal races have ever been. They might treat us as our Aryan fathers treated the aborigines of India (Sudras), as the Dorian Conquerors treated the original inhabitants of Greece (Helots), as the Romans treated their foreign, and especially their Asiatic, prisoners (Slaves and Gladiators), as Charlemagne otherwise so humane was compelled to treat the Saxons under Wittikind, as the Anglo-Saxons treated the Britons, as the Normans treated the Anglo-Saxons, and the compound of both, that is to say, the English treated not long ago the inhabitants of Ireland. Nay, the most significant as well as the most touching instance of the kind is afforded by a people who, gifted, courageous and patriotic beyond the ordinary run, have nevertheless ceased to have national existence and are now exiles and emigrants in all parts of Europe, if not of the whole world. We mean of course the Poles whose history is full of unmistakeable warning to All, especially to us in our present circumstances. Our "Hindu Patriots" should seriously reflect on all these instances especially on the last to draw lessons of wise conduct from them. If they are silly enough to fancy that the British Lion has grown old and therefore imecile, they should, at the some time, never forget that a Lion even on his deathbed is capable of putting to flight nay, tearing to pieces whole herds of sheep and cows—of cowards and dastards who have neither the strengh of individuality nor the power of unanimity. It is not the number but the quality of that number which makes a nation. The number of men who founded the Athenian, the Roman and the Florentine Republics—the number of men who fought for and developed the English Constitution, would sink into utter insignificance before those vast, unwieldy masses which encumber the fertile plains of India. Compare only the 200,000,000 of your Indian population and the 20,000,000 of that brave energetic people who inhabit England (we except Wales). An American hero (of course of the North) once said that one Socrates was worth all the South Carolina States! one

Rajpoot, one Sikh, one Hindoostani or one Maharatti is more worth than one thousand of your *typical* Bengali Baboo in his *costume du chef de cuisine*—fit only to make brilliant speeches and write seditious feuilletons! *Ten and seven horsemen* under an ill-formed fanatical slave came in by the front-door, and your *bonafide* Bengali Rajah went out *in peace (Santis!)* by the back-door inorder that no injury might be done to any living creature—no disturbance might take place in the feeling of *universal Maitre*! What a glaring humiliating contrast to those deeds of stirring heroism which our Ramayana and our Mahabharata celebrate, as does no less our Chand——the greatest and the noblest of our modern Hindu Poets—in his immortal Poem! Read—read those grand Epics of old and the "Prithiraj Charita" and you will see how low—how despicably low you are fallen[*]!

We should therefore try to improve the quality of our number, for of *quantity* we have enough to spare. If then we have the real interests of our country at heart—if we are not mere declamatory lip-patriots but patriots in the sense in which Hampden was once in England, Washington a century ago in America, Thiers but yesterday in France, Bismark now is in Germany, we should direct all our present efforts to master the Physical Sciences—to develope the vast and the various resources of our gifted country as much as possible—to learn and introduce from Europe its Science, Industry, Commerce Political Spirit—to remedy all those grave flaws which are to be detected in the most diversified ramifications of our National Life and when we have slowly but surely (for the process as every process of development must be necessarily slow, developed all those inevitable conditions which alone entitle a nation to Liberty, we *will have* it, because we *deserve* it. Until that time we must be content with such definitions of justice or rather of England's justice to India as Sir F. J. Stephen in his late long letter to the "Times" condescended to enunciate. We are children and must therefore be treated as such. If we would foolishly give ourselves the airs of manhood we should simply make ourselves ridiculous or worse still should be flogged back into surly obedience. Or if we be found quite incorrigible, we should be treated as all incorrigible children once were under the old Spartan Law—we should be utterly exterminated without even a trace to tell our wretched tale. That whole races can be exterminated is a fact quite credible to those who are acquainted with what great historians relate about the Red Indians of America, about the aboriginal inhabitants of Peru " and Mexico. (See among others Draper's "History of the Intellectual Development of Europe,") and about many other races whose simple existence we are now able to conjecture only as the zoologists do that of those half-reptilian or half-aerial Mesozoic Sauria, or that gigantic Pigeon called Dodo (*didus ineptus*—the very name tells you why it was extinct) or that of those well-known Mammoths and Mastodons of the Tertiary Period. We should therefore be wise in due time if we are not to share a similar fate—we should constantly remember and act up to the old adage " First *deserve* and then desire."

A YOUNG HINDU.

Feb. 10. 1878.
Fontainbleau.

এ প্রস্তাবটি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু একটি স্থানের সহিত আমরা ঐক্য হইতে পারি না; সেস্থান যেখানে লেখক ডারউইন সাহেবের মতের অনুমোদন করিয়াছেন। ডারউইনোক্ত নিয়ম অপেক্ষা আর একটি প্রবলতর নিয়ম আছে, সে নিয়ম ধর্ম্মের নিয়ম, যে নিয়মের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য ইংলণ্ডে আদিম নিবাসী রক্ষিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ত. প. স.

---

[*] Those who cannot understand the " Prithiraj Charita" in its grand original which is in old Hindi are requested to read by all means Todd's " Rajasthan" where considerable materials have been drawn from our great Bard's Poem—although it is curiously suggestive that so many of us should read English and some of us even French so well and our own Hindi or Hindui (hence its name) so ill or probably not at all!

সমালোচন।

হিন্দু বিবাহ সমালোচন। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র কর্তৃক প্রণীত, মেদিনীপুর মিসন যন্ত্রে মুদ্রিত। সম্বৎ ১৯৩৫।

আমরা পূর্ব্বে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সমালোচনা করিয়াছিলাম। ভুবনেশ্বর বাবু এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়া বিলক্ষণ যশোলাভ করিয়াছেন; দ্বিতীয় খণ্ড তাঁহার সেই যশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে।

ইনি বর্ত্তমান খণ্ডে বহুবিবাহ, অধিবেদন, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, এবং বিবাহ-ব্যবস্থা সমালোচন করিয়াছেন। তিনি বহুবিবাহ বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১। বর্ত্তমান কৌলীন্য-প্রথা সমাজে আর প্রশ্রয় প্রাপ্ত না হয়। ইহাতে কৌলীন্য মর্য্যাদার ভাগে এক ব্যক্তির বহুদার গ্রহণ এবং এক পাত্রে বহু কন্যা দান নিবারিত ও নিষ্প্রয়োজন হইবে।

২। সমাজে কেহ ইচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া একাধিক ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিবে না, করিলে সামাজিক ও রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। আর ঐ দ্বিতীয়া স্ত্রী ও তদ্গর্ভজাত সন্তানেরা উত্তরাধিকারিত্ব হইতে রহিত হইবে।

গ্রন্থকার অধিবেদন শব্দের এই অর্থ করিয়াছেন। পূর্ব্ব-পরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় বিশিষ্ট কারণানুরোধে ভার্য্যান্তর গ্রহণকে অধিবেদন বলে। ইহা যদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত বহুবিবাহের মধ্যে পরিগণনীয় নহে। গ্রন্থকার অধিবেদন সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

(ক) অধিবেদন-ইচ্ছুক ব্যক্তি পূর্ব্ব-পরিণীতা স্ত্রীর ব্যভিচার ও চির-রুগ্নতা বিষয়ে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিলে রাজা ও সামাজিকগণ তাঁহার অধিবেদন অনুমোদন করিবেন।

(খ) তাদৃশ প্রমাণ প্রদর্শনে অক্ষম হইয়াও যদি কেহ পুনরায় বিবাহ করে তবে সে বিবাহ বহুবিবাহ মধ্যে পরিগণিত হইবে। এবং তাদৃশ পরিণয়কারী তদুপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিধবা-বিবাহের ঔচিত্য প্রদর্শন করিয়া তদ্বিষয়ক পরিচ্ছেদের শেষে গ্রন্থকার বলেন "যেমন রোগধ্বংশ অপেক্ষায় রোগ নিবারণ করা অপেক্ষাকৃত প্রশংসাপর সেই রূপ বৈধব্য ঘটিলে পুনরায় বিবাহানুষ্ঠান অপেক্ষা যুবতীর তাদৃশ অবস্থা না ঘটিতে পারে এরূপ প্রতীকার সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর বলিতেই হইবে। * * * আমাদিগের সামাজিকগণ যথোচিত যত্ন করিলে বর্ত্তমান সমাজের পুরুষমণ্ডলী হইতে প্রবল অকাল মৃত্যু কি বহু অংশে হ্রাস প্রাপ্ত হয় না? না রমণীগণকে কুপাত্রে সম্প্রদান বশত উহাদিগের অচিরে বৈধব্য-দশা-প্রাপ্তি-সম্ভাবনা অনেক খর্ব্ব হইতে পারে না? বোধ হয় অবশ্যই হইতে পারে।"

অসবর্ণ বিবাহ বিষয়ে গ্রন্থকার বলেন "সম ব্যবসায়ী বিভিন্ন শ্রেণী (যেমন তেলি, তাম্বলী, সদ্গোপ, স্বর্ণবনিক, তাঁতী ইত্যাদি) মধ্যে পরস্পর পরিণয় সম্বন্ধ ঘটিলে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অপিচ অধুনা ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য এবং কোন কোন শ্রেণীর নবশাখ সমাজে প্রায় তুল্যাবস্থা। ইহাদিগের আচার ব্যবহারেও তাদৃশ বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। * * * * অতএব এই সকল জাতি মধ্যে স্থল বিশেষে অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইলে পূর্ব্বোক্ত কোন অসুবিধার সম্ভাবনা নাই বরং তদ্দ্বারা অনেক সুফল উদ্ভব হইতে পারে।" কিন্তু গ্রন্থকার হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে এরূপ অসবর্ণ বিবাহ সুসাধ্য না দেখিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতি মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও অন্তঃ শ্রেণী বিভাগ উঠিয়া গিয়া পরস্পরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের ব্যবস্থা দেন। তিনি বলেন "ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কান্যকুব্জ ও রাঢ়ীয় বরেন্দ্র বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণী এবং কায়স্থ জাতির মধ্যে ঐরূপ কান্যকুব্জ, রাঢ়ীয় (উত্তর ও দক্ষিণ) বঙ্গজ, বরেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণী এবং তদন্তর্গত সম্প্রদায়ের নিচয় মধ্যে পরস্পর কন্যাদানাদান প্রচলিত হউক।"

গ্রন্থকার গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে বিবাহ ব্যবস্থা বলিবার সময় মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত অষ্টবিধ বিবাহের বর্ণনা করিয়া বরপাত্রী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিতে অনুরোধ করেন।

(ক) স্বাস্থ্য।
(খ) অবয়ব।
(গ) ধাতু যথা বায়ু প্রধান, পিত্ত প্রধান ইত্যাদি।
(ঘ) সৌন্দর্য্য।
(ঙ) চরিত্র।
(চ) বিদ্যা।
(ছ) বুদ্ধি।
(জ) ধর্ম্ম।
(ঝ) বয়স।

এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার এক স্থলে বলিয়াছেন "বিবাহের মন্ত্র গুলি সংস্কৃত ভাষায় হইলেও তাহার অনুবাদ প্রচলিত ভাষায় হওয়া উচিত। কেন না তদ্দ্বারা বিবাহের উদ্দেশ্য ও দাম্পত্য কর্ত্তব্য বর পাত্রী উভয়ে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। আর কন্যাকর্ত্তাও বুঝিবেন তিনি কি রূপ গুরুতর কার্য্য কি প্রকারে নির্ব্বাহ করিতেছেন।" গ্রন্থকার এস্থলে যে কারণের উল্লেখ করিয়াছেন সেই কারণেই আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ পদ্ধতিতে সংস্কৃত মন্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থকার বিবাহ বিষয়ক প্রাচীন প্রথা সকল সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত রাখিতে চাহেন না অথচ উগ্র ত্বরিত বেগে সমাজ-সংস্কার-কার্য্য সম্পাদন করিয়া হিন্দু সমাজ একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে অভিলাষী নহেন। তাঁহার মত সকল সুসঙ্গত, সুবিহিত, ও পরিমিততা-লক্ষণাক্রান্ত। তিনি এই গ্রন্থে হিন্দু শাস্ত্রে প্রতিপাদিত মতের প্রতি যুক্তি ও অধুনাতন বিজ্ঞানালোক নিয়োগ করিয়া সকল বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রত্যেক পত্র গ্রন্থকারের অসাধারণ বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

আয় ব্যয়

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১৮০০ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৯৪৫ ৸৶/ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত	১৬৭ ৸৶/১০
সমষ্টি	১১১৩ ৸৶/১৫
ব্যয়	৮৮০ ৶/১৫
স্থিত	২৩৩ ॥৶/০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	২০১ ।/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৫৮ ৸৶/১০
পুস্তকালয়	৪১ ॥৶/১৫
যন্ত্রালয়	৪০৭
গচ্ছিত	৩৬ ৸৶/ ৫
সমষ্টি	৯৪৫ ৸৶/ ৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৫০ ৶/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩০০ ।/০
পুস্তকালয়	৮৫ ।৶/০
যন্ত্রালয়	২০৬ ৸৶/১৫
গচ্ছিত	৩৭ ।৶ ৫
সমষ্টি	৮৮০ ৶/১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০
,, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
,, জানকীনাথ ঘোষাল	১০
,, আশুতোষ মল্লিক	১০
,, রাজারাম মুখোপাধ্যায়	৫
,, কানাইলাল পাইন	২
,, শ্যামলাল সুর	২
,, দীননাথ অধ্যেতা	১
,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
	৬১

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র	১০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃপুরের দান	২
,, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
দানাধারে প্রাপ্ত	১০৬৶/০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	১২৶/১৫
	২০১।/১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
চতুর্থ ভাগ
আশ্বিন ১৮০০ শক।

৪২২ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

স্তোত্র।

বলীয়ান ঈশ্বর। অমর প্রেম! যাঁহার মুখ আমরা দেখিতে না পাইয়াও যাঁহাকে বিশ্বাস দ্বারা, কেবল বিশ্বাস দ্বারা, আলিঙ্গন করি, যাঁহাকে আমরা প্রমাণ করিতে না পারিয়াও যাঁহাতে বিশ্বাস করি, তোমারই এই আতপ, তোমারই এই ছায়া, তোমারই এই সকল জ্যোতিষ্ক মণ্ডল। তুমি দ্বিপদ ও চতুষ্পদে প্রাণ সৃজন করিয়াছ, তুমিই মৃত্যুর সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমার মঙ্গলময় পদচিহ্ন শ্মশানে পতিত নর-কপালের উপর পরিলক্ষিত হয়। তুমি আমাদিগকে ধূলিতে পরিণত হইতে দিবে না; তুমি মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছ, সে জানে না কি অভিপ্রায়ে তুমি করিয়াছ; কিন্তু তাহার এই বিশ্বাস যে সে একেবার নিধন প্রাপ্ত হইতে সৃষ্ট হয় নাই। তুমি তাহাকে সৃজন করিয়াছ; তুমি ন্যায়বান। আমাদিগের ইচ্ছা আমাদিগেরই, কিন্তু আমরা জানি না কিরূপে তাহা আমাদিগেরই; আমাদিগের ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার অধীন হইবার জন্য আমাদিগেরই। আমাদিগের ক্ষুদ্র ধর্ম্মমত সকলের যতদিন পরমায়ু তাহারা ততদিন জীবিত থাকে এবং অবশেষে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহারা প্রত্যেকে তোমার জ্যোতির ভগ্নাংশ; তুমি, হে প্রভু! তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর। আমাদিগের কেবল বিশ্বাস আছে; আমরা কিছুই জানিতে পারি না, আমরা কেবল দৃশ্যমান পদার্থ জানিতে পারি তথাপি আমরা বিশ্বাস করি যে সেই জ্ঞান তোমার দ্বারা প্রেরিত। তাহা অন্ধকারমধ্যে একটি কিরণ মাত্র; সেই কিরণ বর্দ্ধিত হউক, কিন্তু জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি আমাদিগের অন্তরে অবস্থিতি করুক যে হৃদয় এবং বুদ্ধি সম্মিলিত হইয়া একতান হইবে কিন্তু তাহারা প্রত্যেকে যে তান উৎপন্ন করে তাহা অপেক্ষা ঐ সম্মিলিত তান শ্রেষ্ঠতর। আমরা অজ্ঞ ও ক্ষুদ্র, যদি আমরা তোমাকে সমতুল্য মনে করিয়া তোমাকে ভয় না করি তাহা হইলে তোমাকে উপহাস করা হয়। নাথ! এই সকল অজ্ঞ সন্তানকে কষ্ট বহন করিতে সক্ষম কর, মোহময় অলীক-সুখাসক্ত জগৎকে তোমার জ্যোতি সহ্য করিতে সমর্থ কর। আমার পাপ সকল ক্ষমা কর, আমার যাহা গুণ তাহাও ক্ষমা কর। যে হেতু মনুষ্যের গুণ, হে

প্রভু! ভ্রান্ত মনুষ্য হইতে প্রাপ্ত, তুমি তোমার গুণ মনুষ্য হইতে প্রাপ্ত হও না। হে পরমাত্মন্! সত্য হইতে আমার প্রচ্যুতি ক্ষমা কর এবং তোমার জ্ঞানে আমাকে জ্ঞানী কর। হে প্রিয় সুহৃদ! তুমি দূরাৎ সুদূরে, তথাপি সুখদুঃখে নিকটে। যখন আমি বিবেচনা করি যে জগতে ক্রম আছে, তাহাতে উচ্চতর এবং নিম্নতর আছে, তখন তোমার প্রতি আমার প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়। তুমি জ্ঞাত অথচ অজ্ঞাত। তুমি আমাদের এমন সুহৃদ, যাহার মৃত্যু নাই; তুমি আমার, আমারই, চিরকাল আমারই। হে আশ্চর্য্য বন্ধু! যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালেই বিদ্যমান! তোমাকে অন্তরতর এবং অন্তরতম রূপে প্রীতি করি কিন্তু তোমার কিছুই জানি না। এক্ষণে বিশ্বজনীন মঙ্গল স্বপ্নস্বরূপ আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে। যখন তাহা প্রতিভাত হয়, তখন তোমাকে সর্ব্বময় দেখি। তোমারই স্বর বহমান বায়ুতে, তোমারই রব প্রবাহিত স্রোতে, তুমি উদীয়মান সূর্য্যে দণ্ডায়মান, তুমি অস্তমান সূর্য্যে অতীব সুন্দর। তুমি কি? আমি বুঝিতে পারি না। কিন্তু যদিও তুমি নিরাকার এবং নক্ষত্র ও পুষ্পে পরিব্যাপ্ত তথাপি নিরাকার বলিয়া তোমাকে আমি অল্প ভালবাসি না। তোমার প্রেম আমার পূর্ব্বকার ক্ষুদ্র প্রেমকে গ্রাস করিয়াছে, আমার প্রেম এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়াছে। তুমি দূরে তথাপি চিরকাল নিকটে, এখনি তোমাকে আমি লাভ করিতেছি, এবং এখনই সুখী, শান্ত ও বন্ধনমুক্ত হইতেছি। আমি তোমার বাণী দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ক্রমশই সম্পদাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি, এক ঈশ্বর, এক নিয়ম, এক আদিভূত এবং এক সুদূর মহৎ ঐশী ঘটনা যাহার দিকে সমস্ত জগৎ চলিতেছে। তুমি চিরকাল বর্ত্তমান, তুমি চিরকালই প্রীতি করিতেছ। আমি মৃত্যুকালে তোমাকে কখনই হারাইব না।

নিষ্কাম প্রীতি।

মানুষ সহস্র পরিমাণে স্বার্থপর হউক, সে সহস্র পরিমাণে সাংসারিক সুখসচ্ছন্দতা ধন মান অথবা যশ প্রাপ্তির আশয়ে কার্য্য করুক, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে মানব প্রকৃতিতে নিষ্কাম প্রীতির ভাব আছে। পুত্র তাঁহার শেষ দশায় প্রতিপালন করিবে, কেবল এই আশায় কি পিতা তাঁহার পুত্রকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল ব'সেন? বন্ধু অর্থানুকূল্য প্রদান করিবেন বলিয়া কি তাঁহাকে আমরা এরূপ প্রীতি করি যে তাঁহার সমাগমে শূন্য পূর্ণ হয় এবং বিপদ সম্পদের ন্যায় প্রতিভাত হয়? মানব-হিতৈষী মহাত্মা কি কেবল যশের নিমিত্ত অবিশ্রান্ত মনুষ্যের হিতসাধন-জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন? স্বদেশীয় লোক তাঁহাকে উচ্চপদ অথবা যথেষ্ট অর্থপ্রদান করিবে বলিয়া কি স্বদেশ-প্রেমাগ্নি-প্রজ্বলিত-চিত্ত মহাত্মা প্রাণের কিছুমাত্র শঙ্কা না করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা জন্য সমরক্ষেত্রে প্রধাবিত হন? কখনই নহে। হিতবাদী দার্শনিকেরা যাহা বলুন না কেন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্য-স্বভাবে নিঃস্বার্থ প্রীতির ভাব আছে। এই নিঃস্বার্থ ভাবের যতই আমরা উন্নতি সাধন করি ততই আমরা মহৎ নামের যোগ্য হই। সামান্য ব্যক্তি ধন মান যশের লালসায় মহৎ কার্য্য করিয়া থাকে কিন্তু সেই ব্যক্তি যথার্থ মহৎ যিনি নিঃস্বার্থ প্রীতি-ভাব দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সেই কার্য্য করেন।

নিষ্কাম প্রীতি তখন অত্যন্ত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয় যখন তাহা ঈশ্বরের প্রতি নিয়োজিত হয়, যখন সেই পরম সুহৃদের অনুপম

গুণে—অনুপম সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া মন একান্ত তাঁহারই হয়, যখন আত্মা সেই বন্ধুর নিকট হইতে তাঁহা ব্যতীত তাঁহার নিকট হইতে আর অন্য কিছু প্রার্থনা করে না। ইন্ধন যেমন অগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হইলে তাহার সকলস্থান অগ্নিময় হয় সেইরূপ উক্ত অবস্থাতে ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কাম প্রীতির ভাব দ্বারা আত্মার সকল বৃত্তি প্রদীপ্ত হয়। এই অবস্থাতে সাধক তাঁহার সকল মনন, সকল বাক্য, সকল কার্য্য ঈশ্বরকে উৎসর্গ করিয়া এই পৃথিবীতেই অমৃতের অবস্থা প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি ঐ প্রেম-প্রভাবে সাংসারিক দুঃখক্লেশ লাঘব করিয়া ও পাপ দমন করিয়া শাশ্বত সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরকে নিঃস্বার্থ ভাবে প্রীতি করা সাংসারিক দুঃখক্লেশ লাঘব করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। যদি সেই প্রেমাষ্পদ আমাদিগকে হত্যা করেন তাহা হইলে আহ্লাদিত চিত্তে শির ত প্রদান করিতেই হইবে। যখন আত্মা সেই ঈশ্বর-প্রেমে নিমগ্ন হয়, তখন দুঃখকে আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না, তখন এই সংসাররূপ সংগ্রাম-ক্ষেত্রের কষ্ট আমরা অপরাজিত চিত্তে সহ্য করিতে পারি। পাপ-প্রবৃত্তি দমন করা মনুষ্য অত্যন্ত দুষ্কর বোধ করে। পাপ-প্রবৃত্তি কখনই উত্তমরূপে দমন হইতে পারে না, যদ্যপি ঈশ্বরের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম মনে প্রজ্জ্বলিত না হয়। পাপের পরাক্রম এমনি প্রবল যে তাহার একটি উপযুক্ত প্রতিপক্ষীয় শক্তি না থাকিলে সে পরাক্রমকে পরাজিত করিতে পারে না। পাপ যেমন একদিকে মনকে প্রবলরূপে আকর্ষণ করিতেছে তেমনি ঈশ্বর-প্রীতি আর একদিকে সেইরূপ প্রবলরূপ আকর্ষণ না করিলে মনুষ্য কেবল অধোগামী হইতে থাকে, কেবল নরক হইতে নিম্নতর নরকে অবতরণ করে। ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি এইরূপ দুঃখক্লেশ, পাপ ও ভয় পরাজিত করিয়া এই পৃথিবীতেই উচ্চতম স্বর্গের সুখ উপভোগ করেন। সূর্য্য অস্তমিত হইলে রজনীর অন্ধকার আসিয়া জগৎকে আচ্ছন্ন করে কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে সূর্য্য অস্তমিত হয় না ও অন্ধকার আগমন করে না। তাঁহার আত্মাতে নিত্য উজ্জ্বল দিবস প্রকাশিত রহিয়াছে।

যোগ।

মনুষ্য যতই কেন পাপতাপে অপবিত্র, এবং শোক মোহে অন্ধীভূত হউক না, তথাচ তাহার জীবনকালমধ্যে সময়ে সময়ে এমন মঙ্গল-মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, যৎকালে সে সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ পরমেশ্বরের দর্শন পাইয়া এক এক বার কৃতার্থ হইয়া থাকে। মনুষ্য যতই কেন ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত বিদূরিত হইয়া অধোগতি লাভ করুক না, ঈশ্বর তাহার মোহান্ধ হৃদয়ে এক একবার বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া তাহাকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন। বিষয়-বিষে মানব-আত্মা যতই কেন বিচেতন ও বিহ্বল হইয়া পড়ুক না, করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর সময়-বিশেষে অবস্থাবিশেষে তাহার সেই বিষজ্বরিত আত্মাতে অমৃত-বিন্দু বর্ষণ দ্বারা তাহাকে জাগ্রত ও প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলেন। তাহার আত্মাতে বিবেক-বৈরাগ্য প্রেরণ করিয়া তাহাকে কল্যাণ-চিন্তায় প্রবৃত্ত করেন। তাহার অন্তরাকাশে প্রকাশিত হইয়া অমৃতের স্বাদ-গ্রহণে সমর্থ করিয়া দেন।

যিনি আমারদের চিরকালের শরণ্য, চিরদিনের সুহৃৎ, অনন্তকালের উপজীবিকা, বিদ্যুতের ন্যায় এক একবার তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া আত্মা চির-পরিতৃপ্ত হয় না—চিরোন্নতি লাভ করিতে পারে না। একদিনের

ভোজন-পানে যেমন আমৃত্যু কখন শারীরিক বল স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না, তেমনই একবার মাত্র ঈশ্বরের দর্শন পাইলে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে, আত্মার অনন্ত উন্নতি সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। নিত্য-নিয়মে পানভোজন করিলে যেমন ক্রমে শরীর দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া থাকে, তেমনই অবিচ্ছেদে ঈশ্বরের সহিত যুক্তাত্মা হইয়া তাঁহার জ্ঞান-প্রেম-অমৃত-সম্ভোগে নিযুক্ত থাকিলে, তবে আত্মা ক্রমে উন্নত পবিত্র ও প্রশস্ত হয়। সেই পরম দেবের সহবাসে থাকিয়া আত্মা অল্পে অল্পে পুণ্যভাব দেবভাব উপার্জ্জন করিতে থাকে।

শরীর প্রাণে যতক্ষণ যুক্ত থাকে, ততক্ষণই যেমন মনুষ্য জীবিত, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যতক্ষণ যোগ থাকে, আত্মাও তেমনি ততক্ষণ সুস্থ প্রকৃতিস্থ, জাগ্রত ও জীবন্ত। পরমাত্মা হইতে বিযুক্ত হইলেই আত্মার স্ফূর্ত্তি-উদ্যম, সৌন্দর্য্য উন্নতি সকলই চলিয়া যায়। তাহার দেবভাব পুণ্যভাব তিরোহিত হয়। অমৃত-ধামের যাত্রী হইয়াও সে সংসার-কারাগৃহের বন্দী হইয়া পড়ে। বৃক্ষ-লতা যতদিন পৃথিবী হইতে রসাকর্ষণ করিতে পারে, ততদিনই যেমন তাহারা পুষ্পফলে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, দুগ্ধপোষ্য শিশু যতকাল মাতার স্তন-দুগ্ধে পরিপোষিত হয়, ততকালই যেমন তাহার প্রকৃত শ্রী সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, অমৃতপায়ী আত্মাও তেমনি যতকাল ঈশ্বরের সহিত অধ্যাত্মযোগে যুক্ত হইয়া তাঁহার অমৃত পান করিতে পারে, ততক্ষণই তাহার উন্নতি এবং ততক্ষণই সে জীবিত।

বৃক্ষ লতা, পশুপক্ষীর ন্যায় আত্মা দুই দিন বা দশ দিন অথবা শত বৎসরের জন্যও সৃষ্ট হয় নাই। আত্মা অমর। আত্মা অনন্তকালের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। আত্মা কেবল পৃথিবীর অধিবাসী নহে, সে অমৃতধামের যাত্রী। পরব্রহ্মের সহিত যোগ-জনিত আনন্দ সম্ভোগের শক্তি সামর্থ্য, এ পৃথিবীতে আর কাহারও নাই। করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর কৃপা করিয়া জীবাত্মাকে কেবল এই উন্নত অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যোগসুলভ স্বর্গীয় উপাদানে মানব-আত্মাকেই তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জল জলের সঙ্গে, বায়ু বায়ুর সঙ্গে, মৃত্তিকা, মৃত্তিকার সঙ্গেই মিলিত হইতে পারে। শরীর, শরীরের সঙ্গেই একত্রিত হইতে সমর্থ হয়, মন, মনের সঙ্গেই সখ্য স্থাপন করিতে পারে, কিন্তু আত্মা পরমাত্মার সহিতই অধ্যাত্ম-যোগে যুক্ত হইতে সমর্থ হয়। সমধর্ম্মী না হইলে কদাচ যোগ হয় না। সেই জন্য প্রেমিক প্রেমিকের সঙ্গে, জ্ঞানী জ্ঞানীর সঙ্গে, সাধু সাধুর-সঙ্গে একপ্রাণ ও একহৃদয় হইয়া থাকেন। সেই কারণেই জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে—সেই পরম সখার সঙ্গে অধ্যাত্ম-যোগে একাত্ম হইয়া থাকিতে পারে। যোগ কি ? যোগ শব্দের অর্থ মিলন। ঈশ্বরের সঙ্গে, আত্মার এমন কি সাদৃশ্য আছে, যাহাতে সে তাঁহার সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিতে পারে। ঈশ্বর অশরীরী, আত্মার আকার নাই। ঈশ্বর অমৃত-স্বরূপ, জীবাত্মা তাঁহার প্রসাদে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। তিনি পূর্ণ-জ্ঞান, আত্মার জ্ঞান আছে, তিনি পূর্ণ-প্রেম পূর্ণমঙ্গল; জীবাত্মার প্রেম ও মঙ্গল ভাব আছে। তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ, জীবাত্মার শিক্ষা সাধন তপস্যা প্রভাবে ক্রমে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ভাব উপার্জ্জন করিবার অধিকার আছে। অতএব শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া সেই পবিত্র স্বরূপের সহিত যুক্তাত্মা হইবার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল হইবে।

যোগ-সাধনের জন্য যেমন আত্ম-প্রভাবের প্রয়োজন, তেমনই দেবপ্রসাদও একান্ত

প্রার্থনীয়। যতদূর আপনার বলে, আপনার যত্নে সম্পাদিত হয়, তাহা সংসাধন করিবে; তৎপরে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর-প্রসাদ প্রার্থনা করিবে। তাঁহার কৃপা, তাঁহার সাহায্য ভিন্ন আমরা একপদও তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইতে পারি না। বালকের বল যেমন রোদন, সাধকের বল তেমনি প্রার্থনা। আমরা তাঁহার প্রার্থী হইলে, তিনি কখনই আমারদিগকে নিরাশ করেন না। সন্তান যেমন মাতাকে চায়, মাতাও যেমন সন্তানকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থান দান করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তেমনই সাধক যেমন ঈশ্বরকে প্রার্থনা করে, ঈশ্বরও তেমনি তাঁহার আত্মাতে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে চান। তিনি যদি আমারদের আত্মাতে আবির্ভূত হইতে না চাহিতেন, তবে আমারদের এমন কি পুণ্যবল, ধর্ম্মবল যে আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে পারিতাম। তিনি যদি আমারদিগকে প্রেমালিঙ্গন না দিতেন—আমারদের হৃদয়-কুটীরে আত্মা-আসনে আপনিই অবতীর্ণ না হইতেন, তবে আমারদের প্রাণের এমন কি মূল্য, যাহার প্রভাবে আমরা তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখিতে পাইতাম। যিনি আমারদের ক্ষুদ্র চক্ষুকে এমনই বিচিত্র কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে আমরা এক দৃষ্টিতে এক কালে নদী গিরি সমুদ্র চন্দ্র সূর্য্য সম্বলিত অর্দ্ধ জগৎ অবলোকন করিতেছি, তিনিই আমারদের আত্মাকে এমনই অপূর্ব্ব উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছেন যে আত্মা ক্ষুদ্র পরিমিত হইয়াও এককালে তাঁহার অনন্ত পূর্ণ ও মহান্ ভাব প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতেছে। আত্মদর্শনে তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গলরূপ সর্ব্বদাই প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ইহাতেই আমরা স্পষ্ট জানিতেছি যে আমারদিগকে তাঁহার সহচর অনুচর করাই তাঁহার একান্ত লক্ষ্য। ইহাতেই সুস্পষ্ট বুঝিতেছি যে তিনি আমারদেরই জন্য, আমরা তাঁহারই নিমিত্ত। এই পৃথিবীতে যদি কাহাকেও আমরা আত্মীয় শব্দে সম্বোধন করিতে পারি, তবে ঈশ্বর ভিন্ন আর আমারদের পরমাত্মীয়,দ্বিতীয় নাই। তাঁহার শরণাগত অনুগত হওয়াই আমারদের শান্তি-মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়। তাঁহার সঙ্গে যুক্তাত্মা হওয়াই অনন্ত উন্নতি লাভের একমাত্র সোপান।

আমারদের জ্ঞান-স্রোতকে সেই অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের সহিত যুক্ত করা, আমারদের প্রীতিকে তাঁহার প্রীতির সহিত যোগ করা, আমারদের মঙ্গল ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত করা, সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরকে সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ অভ্রান্ত আদর্শ করিয়া সর্ব্বাঙ্গীনরূপে তাঁহারই অনুকরণ করাই যোগ। অনিমেষ জ্ঞান-নেত্রে তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখার নামই অধ্যাত্ম যোগ। যে কৃতপুণ্য সাধু, এই অধ্যাত্ম-যোগে ঈশ্বরের সহিত যুক্তাত্মা হইয়াছেন, তিনিই সংসারের পাপ তাপ, হর্ষ শোক হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতেই রমণ করেন এবং অকুতোভয়ে অপরাজিত উৎসাহে সেই প্রাণসখার প্রিয়কার্য্য সাধনে যত্নশীল থাকেন। তাঁহার কথা বলিতে, তাঁহারই মাহাত্ম্য প্রচার করিতে, তাঁহারই অমৃতময় তত্ত্ব ধ্যান ধারণা জল্পনা করিতেই তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই উৎসুক। তাঁহার কথা ভিন্ন অন্য কথা আর তাঁহার পক্ষে সুখকর আনন্দকর ও তৃপ্তিকর হয় না, সুতরাং ইহাঁকে অতিক্রম করিয়া তিনি আর কোন কথাই কহেন না। প্রাণোহেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি, বিজানন্ বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতি ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।

ঈশ্বরের সহিত আত্মার যে জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ ও প্রেমযোগের সঞ্চার হই-

[illegible]ছে, কি লক্ষণ বা নিদর্শন দ্বারা সাধক তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে সমর্থ হয়? যখন ঈশ্বরের লক্ষ্যের সহিত আমার লক্ষ্যের মিল হয়, যখন তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছার যোগ হয়, যখন তাঁহার মঙ্গল কামনার সহিত আমার কামনা একীভূত হয় তখনই প্রত্যক্ষ বলিতে পারি যে আত্মা তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত হইতেছে। যখন তাঁহার জগতের মঙ্গল আমার মঙ্গল, তাঁহার সত্যের জয়ে আমার জয়, তাঁহার জ্ঞানধর্ম্ম প্রচারে আমার আনন্দ অনুভব হইতে থাকে, তখনই প্রত্যক্ষ জানিতে পারি, তাঁহার সহিত আমার আত্মার যোগ হইয়াছে। ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রেত, যখন আমারও তাহাই কামনা; তাঁহার যাহা লক্ষ্য, যখন আমার তাহাই কার্য্য হইয়া উঠে, তখনই প্রত্যক্ষ জানিতে পারি যে তাঁহার সহিত আমার আত্মার প্রকৃত যোগ নিবন্ধ হইয়াছে। যখন আমার ইচ্ছা আর দ্বিধা ভাব ধারণ না করে, যখন আমার লক্ষ্য আর স্বার্থদূষিত না হয়, যখন আমার কার্য্য ফলকামনাশূন্য হয়, তখনই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি যে পরমাত্মার সঙ্গে আমার যোগ সঞ্চার হইয়াছে। তখন আত্মা কি মনোহর ভাব ধারণ করে! কি আশ্চর্য্য দেব-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়! তখন আত্মা অধোলোকের শিক্ষা সাধন উন্নতির চরম সীমায় উত্থিত হইয়া, সত্য-স্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে স্বীয় শরীরের পরমাকাশে আত্মস্থ করিয়া, সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করিতে থাকে। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

এই যোগই সাধকের লক্ষ্য, এই যোগই তাহার কামনা, এই যোগই তাহার কার্য্য। যাহাতে আত্মা এই যোগভ্রষ্ট না হয়, তৎপ্রতি সাধকের সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যোগসাধন যেমন বহু-আয়াস-সাপেক্ষ যোগ-রক্ষাও তেমনি বহুযত্ন ও বহু তপস্যাধীন। অতএব সাধক যোগের গাঢ়তা সম্পাদন জন্য, যোগ-বিঘ্ন-নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বদা পরব্রহ্মের ধ্যানধারণায় নিযুক্ত থাকিবেন। অনন্যমনা হইয়া সর্ব্বক্ষণই তাঁহার বরণীয় জ্ঞান শক্তি চিন্তায় নিমগ্ন হইবেন।

হে পরমাত্মন্! আমরা পাপতাপে অপবিত্র হইলেও তুমি কৃপা করিয়া আমারদের আত্মাতে এক একবার দর্শন দিয়া এই অধোলোকেই আমারদিগকে কৃতার্থ করিতেছ। মুহূর্ত্তের জন্য তোমার সহবাস লাভ করিয়া আমারদের আত্মা যেরূপ সুখ সচ্ছন্দতা উপভোগ করে, আর কিছুতেই সে তাহার অনুরূপ শান্তি মঙ্গল, আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। সেই এক এক নিমেষের যোগেই আমরা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিতেছি যে তুমি ভিন্ন আর আমারদের আরাম-স্থান নাই, তুমি ভিন্ন আর আমারদের শিক্ষাসাধন উন্নতির দ্বিতীয় সোপান নাই। তুমিই আমারদের "একায়নং"। যখন তুমি কৃপা করিয়া আমারদের আত্মাতে এক একবার দর্শন দিতেছ, তখন আর আমারদিগকে পরিত্যাগ করিও না। আমরা পাপী তাপী হইলেও তোমার পুত্র ভিন্ন আর কাহারও নহি। আমরা দুষ্ট দুরাচার ও স্বেচ্ছাচারী হইলেও তোমার চিরাশ্রিত চিরভিখারী ভিন্ন আর কাহারও দ্বারস্থ নহি। হে ঈশ্বর! তুমি সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া যাহাতে তোমার সহচর অনুচর হইয়া থাকিতে পারি তুমি কৃপা করিয়া আমারদিগকে এরূপ ধর্ম্মবল ও শুভবুদ্ধি প্রদান কর। তোমার সন্নিধানে এইই আমারদের কামনা, কেবল এইই আমারদের আন্তরিক প্রার্থনা।

অসভ্য জাতিগণের সৌন্দর্য্যের ভাব।

সৌন্দর্য্যানুরাগ মনুষ্য-হৃদয়ের একটি অতি গভীর স্বাভাবিক বৃত্তি। সভ্য, অসভ্য, ধনী, নির্ধন, বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ, স্ত্রী সকলেই সৌন্দর্য্য ভাল বাসে। কিন্তু সকলের সৌন্দর্য্যের ভাব এক নহে। সভ্য জাতিরা যাহা সুন্দর বলে, অসভ্য জাতিরা তাহা হয়ত সুন্দর বলে না। আমি যাহাকে সুন্দর বলি হয় ত আর এক ব্যক্তি তাহাকে কুৎসিত বলিবে। এই রূপ সকল জাতি এমন কি এক জাতীয় সকল মনুষ্যের সৌন্দর্য্যের ভাব সমান নহে। পৃথিবীর সভ্য জাতির সৌন্দর্য্যের ভাব হইতে অসভ্য জাতির সৌন্দর্য্যের ভাব কতদূর বিভিন্ন তাহা আমরা এই প্রস্তাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আমেরিকা-নিবাসী অসভ্যেরা যে স্ত্রীলোকের প্রশস্ত চৌরস মুখ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু, উচ্চ অস্থিবিশিষ্ট কপোল, পিঙ্গলবর্ণ গাত্র, অপ্রশস্ত কপাল, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও স্থূল নাসিকা আছে তাহাকে পরমা সুন্দরী বলিয়া সমাদর করে। পর্য্যটক পেলাস বলেন, চীন দেশের উত্তর ভাগস্থ দেশ সমূহে প্রশস্ত নাসিকা ও দীর্ঘ কর্ণ সৌন্দর্য্যের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। চীন দেশে ও জাপান দ্বীপে চক্ষুর বক্রদৃষ্টি সৌন্দর্য্যের প্রধান চিহ্ন। বিখ্যাত ভ্রমণকারী ফিন্‌লেসন বলেন যে কোচিন চীন নিবাসীদিগের প্রায় গোলাকার মুখ দেখা যায়, এবং তাহারা যে সকল স্ত্রীলোকের মুখ সম্পূর্ণ গোলাকার সেই সকল স্ত্রীলোককে সুন্দরী বলিয়া থাকে। হটেণ্টট্ নামক অসভ্য জাতির মধ্যে যে সকল স্ত্রীলোকের পৃষ্ঠ দেশ উন্নত তাহারা সুন্দরী বলিয়া বিবেচিত হয়। ঐ জাতীয় পুরুষেরা উন্নত-পৃষ্ঠ-বিশিষ্টা অথবা কুব্জা স্ত্রীলোককেই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী জ্ঞান করে ও এতাদৃশ রূপ-সম্পন্ন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে অ-অনেকে প্রার্থী হয়। আফ্রিকা নিবাসী অসভ্য জাতিরা কৃষ্ণবর্ণকে সৌন্দর্য্যের চিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহারা ইংরাজদিগের গৌর বর্ণকে অতিশয় ঘৃণা করে। ঐ সকল অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যদি কোন স্ত্রী বা পুরুষ অপেক্ষাকৃত গৌরবর্ণ হয় তাহা হইলে তাহাদিগের বিবাহ হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে। এক জনকে গৌর-বর্ণ-বিশিষ্ট বলা কাফির নামক আফ্রিকাস্থ অসভ্য জাতি মধ্যে নিতান্ত অপমানসূচক বাক্য। জুলু নামক দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ অসভ্য জাতীয় রাজার "কৃষ্ণবর্ণ" অত্যন্ত সম্মান-সূচক উপাধি। জাবাদ্বীপবাসীদিগের মধ্যে কোন বালিকা ও যুবতী পীতবর্ণা হইলে সে অনুপম সুন্দরী বলিয়া বিবেচিত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি অসভ্য জাতিরা দীর্ঘ কেশপাশ সৌন্দর্য্যের চিহ্ন বলিয়া বিবেচনা করে। যাহার মস্তকের কেশ যত দূর দীর্ঘ তাহাকে তত সুন্দর বা সুন্দরী বলিয়া জ্ঞান করা হয়। ঐ দেশের ক্রাউ নামক জাতি মধ্যে যে ব্যক্তির সর্ব্বাপেক্ষা কেশ দীর্ঘ তাহাকে রাজপদে অভিষেক করা হয়। এক জন ইংরাজ পর্য্যটক বলেন যে একদা ঐ জাতির কোন বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে তাহারা আপনাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকেশযুক্ত ব্যক্তিকে রাজা ও অধিনায়ক-পদে নিযুক্ত করে ইহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া ছিলেন। ঐ ব্যক্তির কেশপাশ ৭ হস্ত দীর্ঘ ছিল। কুইচ ও অমর নামক দক্ষিণ আমেরিকার জাতিদ্বয়ের মধ্যে মস্তকের সুদীর্ঘ কেশ সৌন্দর্য্যের প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হয়। মস্তকের কেশ ছেদন করিয়া দেওয়া তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার অসভ্য জাতিগণ মস্তকের সুদীর্ঘ কেশ সৌন্দর্য্যের প্রধান উপকরণ বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু শ্মশ্রু ধারণ অসৌন্দর্য্যের কারণ বিবেচনা করে। পেরাগুয়ে নিবাসী অসভ্যেরা মুখে একটিও কেশ থাকিলে তাহা নিতান্ত কদর্য্য জ্ঞান করে। এই জন্য ইহারা চক্ষুর পাতার ও ভ্রূযুগলের কেশ সকল উৎপাটন করিয়া ফেলে। ক্যালমক্ জাতি ও পোলিনেসীয়া নিবাসীদিগের মধ্যেও এইরূপ প্রথা দৃষ্টিগোচর হয়। জাপানদ্বীপবাসীদিগের বিশ্বাস এই যে গোঁপ রাখিলে কুৎসিত দেখায়। ইংরাজেরা গোঁপ রাখিয়া থাকে দেখিয়া তাহারা হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। নিউজিলণ্ড-বাসীরাও মুখের কোন স্থানে একটিও কেশ রাখে না। তাহাদিগের মধ্যে একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে কেশাবৃত মুখবিশিষ্ট পুরুষের বিবাহ অসম্ভব। পোলিনেসিয়া, নিউজিলেণ্ড, এবং প্রশান্ত মহাসাগরস্থ টঙ্গা ও সেমোয়া নামক দ্বীপদ্বয় নিবাসী ও কেলমক জাতি স্বভাবতই শ্মশ্রুবিহীন, তজ্জন্যই বোধ হয় ইহারা শ্মশ্রু নিতান্ত কুৎসিত ও কদর্য্য বিবেচনা করে। আবার আফ্রিকার মকনলো জাতি ও ফিজিয়ানেরা সুদীর্ঘ শ্মশ্রু সৌন্দর্য্যের প্রধান চিহ্ন জ্ঞান করে।

আমেরিকার কোন কোন অসভ্য জাতি চৌরস মস্তক এবং কোন কোন জাতি উচ্চ মস্তক সৌন্দর্য্যের চিহ্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। যাহারা উচ্চ মস্তক সৌন্দর্য্যের লক্ষণ জ্ঞান করে তাহারা নানা উপায়ে মস্তক মন্দিরের ন্যায় উচ্চ করিয়া থাকে। আরাকান নিবাসীরা প্রশস্ত, নিম্ন, ও চৌরস কপাল সুন্দর বিবেচনা করে এবং যাহারা স্বভাবতঃ অপ্রশস্ত ও উচ্চ কপাল-বিশিষ্ট তাহারা আপনাদিগের কপাল সুন্দর অর্থাৎ নিম্ন ও চৌরস করিবার জন্য এক খণ্ড সীশার ভারযুক্ত পাত বাল্যকাল হইতে কপালে বাঁধিয়া রাখে। টাহিটি ও সুমাত্রা দ্বীপ ও ব্রেজিলরাজ্যনিবাসিগণ এবং আফ্রিকার হটেণ্টট ও নিগ্রো জাতিরা দীর্ঘ নাসিকাকে অতি সুন্দর জ্ঞান করে। চীন দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ক্ষুদ্র পদ অতিশয় সৌন্দর্য্যের চিহ্ন বোধ করে, এবং ঐ দেশীয় সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগের স্বাভাবিক ক্ষুদ্র পদদ্বয় নানা কৃত্রিম উপায়ে আরও ক্ষুদ্র করিয়া থাকে।

আফ্রিকার কোন কোন জাতি চক্ষুর পাতা কৃষ্ণবর্ণে ও নখরের উপরিভাগ পীত বা ধূম্রবর্ণে রঞ্জিত করা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক বিবেচনা করে। কোন কোন অসভ্যজাতি মুক্তাপংক্তির ন্যায় শুভ্র দন্তকে কুৎসিত বিবেচনা করিয়া তাহা কৃষ্ণ কিম্বা নীল বর্ণে রঞ্জিত করে। আফ্রিকার অন্তঃপাতী কর্ডোফান ও ডরফুর নামক প্রদেশনিবাসীরা নানা কৃত্রিম উপায়ে শরীরের কোন কোন স্থান আবের ন্যায় স্ফীত করিয়া থাকে। যাহার গাত্রের অনেক স্থল ঐরূপ স্ফীত থাকে সে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা সুন্দরী বলিয়া সকলের নিকট আদৃত হয়। পুরাকালীন ইহুদিরা ও ব্রীটনেরা উল্কী ধারণ বিশেষ সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক মনে করিত। বর্ত্তমান কালে উত্তর সাগর হইতে নিউজিলণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এমন একটি প্রধান দেশ নাই যদ্দেশবাসীরা উল্কী না পরিয়া থাকে অথবা উল্কী পরা সৌন্দর্য্যের চিহ্ন জ্ঞান না করে। উত্তর নাইলতীরবাসী জাতিরা সম্মুখস্থ চারিটী কুক্কুরদন্ত অতি কদর্য্য ও সৌন্দর্য্যের হানিকর বিবেচনা করে এবং তজ্জন্য তাহা উৎপাটন করিয়া ফেলে। দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকা-নিবাসী অসভ্য জাতিরা উপরের কিম্বা নিম্নের ওষ্ঠ বিদ্ধ করিয়া থাকে। আফ্রিকার বটকুদ জাতীয় লোকেরা নিম্ন ওষ্ঠ এত দীর্ঘ করিয়া বিদ্ধ করিয়া থাকে যে তাহার মধ্য দিয়া ৪ ইঞ্চি

ব্যাসের একটি কাষ্ঠখণ্ড অনায়াসে রক্ষিত হয়। মধ্য আফ্রিকা নিবাসী অসভ্য স্ত্রীলোকেরা নিম্ন ওষ্ঠ বিদ্ধ করিয়া তাহাতে একটি দোদুল্যমান লম্বা অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে; বাক্যালাপ সময়ে তাহা এরূপ ভাবে দুলিতে থাকে যে তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। আফ্রিকার অন্তঃপাতী লেটুকা নামক প্রদেশের অধীশ্বরী বিখ্যাত ইংরাজপর্য্যটক সার সামুয়েল বেকরকে বলিয়াছিলেন যে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যদ্যপি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিম্ন ওষ্ঠ বিদ্ধ করিয়া তাহাতে লম্বা দোদুল্যমান অলঙ্কার পরিধান করাইয়া দেন তাহা হইলে তাঁহার সৌন্দর্য্য অনেক বর্দ্ধিত হইবে। লেটুকা প্রদেশের দক্ষিণস্থ মাকালল নামক প্রদেশস্থ স্ত্রীলোকেরা উপরকার ওষ্ঠ বিদ্ধ করিয়া তাহাতে বংশ-নির্ম্মিত কিম্বা কোন ধাতুনির্ম্মিত এতদ্দেশ-ব্যবহৃত নথের ন্যায় গোলাকার এক প্রকার অলঙ্কার পরিধান করে। ইহারা এই অলঙ্কারকে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক বিবেচনা করিয়া থাকে। এই অলঙ্কারের নাম পেলিলি। ঐ দেশের পুরুষেরা বলে যে শ্মশ্রু যেমন পুরুষের সৌন্দর্য্যের একমাত্র কারণ সেইরূপ পেলিলি অলঙ্কার স্ত্রীলোকের একমাত্র সৌন্দর্য্যের কারণ।

পশুদিগের মানসিক বৃত্তি।

আমাদিগের মধ্যে অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পশুদিগের স্বাভাবিক অন্ধ সংস্কার ভিন্ন বুদ্ধি, বিবেচনা, ও স্মরণ শক্তি এবং স্নেহ, দয়া, প্রেম, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি কোমল মানসিক বৃত্তি নাই। কিন্তু এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক এবং প্রাণিতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিকদিগের সম্পূর্ণ মত-বিরোধী। পশুরা যে স্বাভাবিক অন্ধ সংস্কার ব্যতীত কতকগুলি মানসিক বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে, তাহা আমরা এই প্রস্তাবে পাঠকবর্গকে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

পশুদিগের যে অল্প পরিমাণে বুদ্ধি-শক্তি আছে, তাহারা যে বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে, এবিষয়ে প্রাণিতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিকগণের দ্বিধা মত নাই। গৃহ-পালিত কিম্বা বন্য সকল-প্রকার পশুকেই কোন রূপ কার্য্য-প্রবৃত্তির অগ্রে কিয়ৎক্ষণ স্থির ভাব অবলম্বন ও বিবেচনা পূর্ব্বক সুদৃঢ় সংকল্পে কার্য্য করিতে দেখা যায়। রেঙ্গার (Rengger) নামক ইউরোপীয় কোন সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ তাঁহার পালিত বানরদিগের বুদ্ধি ও বিবেচনা সম্পর্কে কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য উদাহরণ দিয়াছেন। রেঙ্গার যখন সর্ব্বপ্রথম তাঁহার একটি বানরকে হংস-ডিম্ব খাইতে দেন তখন সে উহা ভাঙ্গিতে গিয়া এককালে চূর্ণ করিয়া ফেলে এবং তজ্জন্য ঐ ডিম্বের অনেক সার অংশ নষ্ট হয়। পরে ঐ বানরকে খাইবার জন্য যত ডিম্ব দেওয়া হইত সে তাহা প্রথমে একটি দৃঢ় পদার্থে অতি ধীরে ধীরে আঘাত করিত এবং উহার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ ফুটা করিয়া পরে হস্ত দ্বারা ইহার ছাল উঠাইয়া ফেলিত ও খাইত। একবার একটি বানর এক খানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় শরীরের একস্থান কাটিয়া ফেলিয়াছিল, এই ঘটনার পরে তাহাকে যদি যখন কোন অস্ত্র দেওয়া হইত সে তাহা ভয়ে ভয়ে সাবধানে ব্যবহার করিত। রেঙ্গার তাঁহার গৃহ-পালিত বানরদিগকে সর্ব্বদাই কাগজের মোড়কের মধ্যে করিয়া মিছরির টুকরা দিতেন। একদা তিনি পরীক্ষার্থ একটা বানরকে ঐরূপ কাগজের মোড়ক করিয়া মিছরির টুকরার পরিবর্ত্তে একটি জীবন্ত বোলতা দেন। বানর মিছরি মনে করিয়া যেমন ঐ কাগজের মোড়ক

খুলিল বোলতা তৎক্ষণাৎ আঘাত পাইয়া তাহাকে গিয়া সক্রোধে দংশন করিল। এই ঘটনার পরে রেঞ্জার যখনই কাগজের মোড়ক করিয়া কোন খাদ্য সামগ্রী দিতেন ঐ বানরটি তাহা অতি সাবধানে উঠাইয়া লইত এবং তন্মধ্যে বোলতা কিম্বা অন্য কোন জীবন্ত প্রাণী আছে কিনা জানিবার জন্য তাহা কর্ণের কাছে ধরিয়া তাহার ভিতর কোন শব্দ হইতেছে কিনা তাহা বিশেষরূপে বুঝিয়া পরে তাহা খুলিত। কলকোহন নামক কোন ইংরাজ শিকারী একদা এক নদী-তীরে দুইটি হংসকে গুলি করেন; হংসদ্বয় পক্ষপুটে আহত হইয়া নদীর পর পারে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে থাকে। এই অবসরে শিকারী কলকোহন তাঁহার কুকুরকে সঙ্কেত করিলেন। কুক্কুর সঙ্কেত পাইবামাত্র সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইয়া এককালে দুইটি হংসকে আনিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইল না। ঐ দুইটি হংস তখনও পর্য্যন্ত জীবিত আছে, তাহা দেখিয়া কুক্কুর একটিকে আনিতে আর একটি পলাইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় দুইটিকে বধ করিল এবং দুইবারে দুইটিকে লইয়া তাহার প্রভুর নিকট উপস্থিত হইল। কর্ণেল হচিনসন্ বলেন যে একদা তিনি এক যোড়া তিত্তিরী পক্ষীকে গুলি করেন। তন্মধ্যে একটি হত হয়, অপরটি পক্ষপুটে আহত হইয়া ভূতলশায়ী হয়, এবং দৌড়াইয়া পলাইতে আরম্ভ করে। তদ্দৃষ্টে তাঁহার সমভিব্যাহারী শিকারী কুক্কুর বেগে গিয়া উহাকে ধরে; সে যখন উহাকে লইয়া প্রভুর নিকটে প্রত্যাগমন করে তখন দেখিল পথিমধ্যে হত পক্ষীটি পড়িয়া আছে। সে তাহাকে উঠাইয়া লইতে চেষ্টা করিল কিন্তু যখন বুঝিল যে উহাকে লইতে গেলে আহত পক্ষীটি পলাইবার সুযোগ পায়, তখন সে আহতকে এককালে বধ করিল, পরে দুইটি পক্ষীকে লইয়া তাহার প্রভুর নিকট উপস্থিত হইল। বিচক্ষণ প্রাণিতত্ত্ববিদ গার্ডনার (Gardner) বলেন যে একদা তিনি কোন এক নদী-তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রমণ-কালে দেখিলেন তথায় একটা কাঁকড়া গর্ত্ত খুলিতেছে। তিনি তাহা দেখিয়া ঐ গর্ত্তের দ্বারে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। এক খণ্ড প্রস্তর গর্ত্তের ভিতর গিয়া পড়িল, আর তিন চারি খণ্ড উহার মুখের নিকট পড়িয়া রহিল। তখন কাঁকড়াটি পাঁচ মিনিটের মধ্যে গর্ত্ত মধ্যে পতিত প্রস্তর খণ্ডগুলি উঠাইয়া গর্ত্তের বাহিরে আনিয়া ফেলিল। কিন্তু যখন দেখিল যে আরও কয়েক খণ্ড প্রস্তর গর্ত্তের মুখের নিকট রহিয়াছে, তাহা ভিতরে পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা, তখন সে সেই গুলি তথা হইতে দূরে রাখিয়া পুনর্ব্বার গর্ত্ত খুলিতে লাগিল। এই সমস্ত বৃত্তান্ত প্রাণিতত্ত্ববিৎদিগের বর্ণিত, এই সকল পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে পশুদিগের কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তি আছে।

কল্পনাশক্তি মনুষ্যের একটি প্রধান মানসিক বৃত্তি। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন পশুদিগের যে কল্পনা-শক্তি আছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কল্পনা-শক্তি না থকিলে স্বপ্ন দেখা অসম্ভব হইত। স্বপ্ন দেখা কল্পনাশক্তির কার্য্য। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা কহেন কুক্কুর, বিড়াল, ঘোটক, প্রভৃতি পশুরা স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, ইহার বিস্তর নিদর্শন আছে।

পশুদিগের যে তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি আছে, সকলেই আপনাদিগের পালিত পশুদিগের নিকট তাহার অকাট্য প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারেন, তথাপি কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। উত্তমাশা অন্তরীপে সার এণ্ড স্মিথ্ নামে কোন বিখ্যাত

ইংরাজের এক বানর ছিল; কোন কার্য্য বশত তিনি তথা হইতে দেশান্তর প্রস্থান করেন এবং নয় মাস পরে তথায় প্রত্যাগমন করেন। ঐ বানর এই দীর্ঘ কাল ব্যবধানেও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ ডারউইন সাহেবের এক কুক্কুর ছিল। সে আপনার প্রভু ভিন্ন আর কাহারও নিকট যাইত না। একদা ডারউইন তাহার স্মরণশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পাঁচ বৎসর ছয় মাসকাল কোন এক দূরস্থ গ্রামে রাখিয়া আইসেন এবং ঐ দীর্ঘ কালের পর তিনি পুনর্ব্বার তাহার নিকট যান। সে তখন তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল এবং তিনি যাহা আজ্ঞা করিতে লাগিলেন তাহা করিতে লাগিল। পিয়ার হিউবর (Pierre Huber) নামক সুবিখ্যাত পিপীলিকাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন যে পিপীলিকাগণের আশ্চর্য্য স্মরণ-শক্তি আছে। তিনি বলেন এক দল পিপালিকা অন্য একটি দল পিপীলিকা হইতে চারি মাস কালের জন্য স্থানান্তর হইয়াছিল, পরে তাহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু তাহাদের আকার ইঙ্গিতে অনুমান হইল যে এত দিনের পরেও তাহারা পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিয়াছে।

বিষয়ে মনঃসংযোগের শক্তি মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতির প্রধান উপায় বলিতে হইবে। পশুদিগেরও যে মনঃসংযোগ করিবার শক্তি আছে তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন একটি বিড়াল পাখী কিম্বা ইন্দুর শীকার করে তখন সে লক্ষ্যে কতদূর স্থিরতা ও মনঃসংযোগের সহিত দৃষ্টি রাখিয়া তাহা ধরিবার চেষ্টা করে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র জন্তুসকল শীকার করিবার সময় লক্ষ্যের প্রতি এত দূর মনঃসংযোগ করিয়া থাকে যে ঐ সময় অবাধে তাহার নিকটে গিয়া অনায়াসে তাহাকে অস্ত্র দ্বারা বধ করা যায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যাহারা বানরের ক্রীড়া প্রদর্শন করাইয়া বেড়ায় তাহারা বানর ক্রয় করিবার সময় যে বানরগুলি অধিক কাল মনঃসংযোগ করিতে পারে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে অধিক মূল্যে ক্রয় করে, কারণ তাহারাই অল্প সময়ের মধ্যে নানারূপ ক্রীড়া শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

মনুষ্যের অনুকরণ-শক্তি তাহার উন্নতির অনেক সহায়তা করে। দেখা যায় কোন কোন পশুরও বিশেষ অনুকরণ-শক্তি আছে। এক জন প্রাণিবিদ্যাবিৎ বলেন যে এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির দুইটি ব্যাঘ্রশাবক কোন এক স্ত্রীজাতীয় কুকুর দ্বারা পালিত হইয়াছিল। ঐ দুইটি ব্যাঘ্র-শাবক বড় হইলে কুকুরের ন্যায় চিৎকার করিত। ডারউইন সাহেব কোন কোন শৃগালকেও কুকুরের অনুরূপ চীৎকার করিতে শুনিয়াছেন। বানরের অনুকরণ-শক্তি সকল-পশুর অপেক্ষা অধিক। ইহারা যে অনায়াসে মনুষ্যের অনুকরণ করিয়া থাকে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। পক্ষিজাতি অনুকরণে বিশেষ পটু। কতকগুলি বিশেষ জাতীয় পক্ষী অন্যান্য পক্ষীর শব্দ ও সঙ্গীতধ্বনি আশ্চর্য্য রূপে অনুকরণ করিতে পারে। শুক, টিয়া ময়না প্রভৃতি পক্ষীর অসামান্য অনুকরণ-শক্তি আছে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বঙ্গদেশে ভীমরাজ অথবা ভৃঙ্গরাজ নামে এক জাতীয় পক্ষী আছে। উহারা যে শব্দ শুনিতে পায় তৎক্ষণাৎ অবিকল তাহা অনুকরণ করিয়া থাকে।

কোন একটি নূতন ও অসামান্য বস্তু দেখিলে মনুষ্য যেমন বিস্মিত হয় তেমনি পশুরাও কোন নূতন ও অসামান্য বস্তু দেখিলে

বিস্মিত হয় এরূপ দেখা গিয়াছে। কোন কোন পশু নূতন বস্তু দেখিবার কি জানিবার জন্য মনুষ্যের ন্যায় কৌতূহল পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া থাকে। ব্রেম (Brehm) নামক সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বলেন এক সময়ে তাঁহার আশ্রয়ে কয়েকটি বানর ছিল। উহারা সর্পকে অত্যন্ত ভয় করিত। একদা তিনি একটি বাক্সে পরীক্ষার্থ কতকগুলি সর্প রাখিয়াছিলেন। বানরেরা জানিত যে ঐ বাক্সে সর্প আছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহারা এতদূর কৌতূহলাক্রান্ত হইত যে কখন কখন তাহারা একে একে ঐ বাক্সের ডালা উঠাইয়া সর্পগুলিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। একদা এই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ডারউইন সাহেব লণ্ডনের পশ্বালয়ের যে গৃহে বানর থাকে সেই গৃহে একটি মৃত সর্প লইয়া গিয়া তাহাদিগের সম্মুখে নিক্ষেপ করেন। সর্প দেখিয়া বানরগুলা ভয়ে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিল। পরিশেষে যখন দেখিল যে উহা স্পন্দহীন নির্জীব তখন তাহারা সাহস আশ্রয় করিল এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একে একে তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া অতি মনোযোগের সহিত তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ডারউইন সাহেব বানরদিগের কৌতূহল-বৃত্তি পরীক্ষার্থ কখন কখন উহাদিগের মধ্যে মৃত মৎস্য, ইন্দুর, বা অন্য কোন ক্ষুদ্র প্রাণী নিক্ষেপ করিতেন এবং প্রতিবারেই বানরেরা সমান আশ্চর্য্যের ভাব ও কৌতূহল প্রকাশ করিত।

কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মানসিক বৃত্তিও কোন কোন পশুদিগের মধ্যে দেখা যায়। অনেকে কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশুদিগের কৃতজ্ঞতা, ভক্তি স্নেহ ও দয়ার বিশেষ নিদর্শন পাইয়াছেন। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞগণ কর্ত্তৃক প্রণীত প্রাণি-বৃত্তান্তে নানা পশু ও পক্ষীর স্নেহ দয়া প্রভৃতি গুণের ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমরা এক্ষণে ইহার কয়েকটি উদাহরণ দিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। কাপ্তেন ষ্টানসবরি সাহেব দেখিয়াছেন, আমেরিকার উটা নামক স্থানে কতক গুলি পেলিকান পক্ষী একটি বৃদ্ধ চলৎশক্তি-বিহীন অন্ধ ভক্ষ্য-আহরণে অপারগ একটি পেলিকান পক্ষীকে প্রত্যহ আহার যোগাইত। ব্লিথ সাহেব বলেন যে তিনি যখন ভারতবর্ষে ভ্রমণ করেন তখন দেখিয়াছেন, কোন স্থানে কতকগুলি কাক একটি অন্ধ বৃদ্ধ কাককে আহার দিতেছে। গৃহপালিত কুক্কুটদিগের মধ্যেও এই রূপ দয়া ও স্নেহের দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডারউইন সাহেব বলেন "একটি বিড়াল ও একটি কুকুরের পরস্পর অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। একদা ঐ বিড়ালটি পীড়িত হইয়া কিছুকাল চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়ে, তৎকালে কুকুরটি সর্ব্বদা ঐ বিড়ালের নিকট যাইয়া তাহার গাত্র লেহন করিত এবং তাহার প্রতি স্নেহ মমতা প্রকাশ করিত। গৃহপালিত কুকুরের প্রভুভক্তির অনেক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত আছে। প্রভুকে কোন মনুষ্য কিম্বা কোন জন্তু আক্রমণ করিলে কুকুর তাহাকে যথাসাধ্য তাহার প্রতিফল দিতে ত্রুটি করে না। বানরদিগেরও দয়া ও স্নেহের নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। একদা বিলাতের পশ্বালয়ের একটি গৃহে দুইটি বানর রক্ষিত হয়, একটি আমেরিকা দেশীয় ক্ষুদ্র বানর, অপরটি আফ্রিকার বৃহদাকার বানর। ইহাদিগের একজন রক্ষক নিযুক্ত ছিল। ক্ষুদ্র বানরটি রক্ষকের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। একদিন বৃহদাকার বানরটি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ রক্ষকের গলদেশ সাংঘাতিকরূপে কামড়াইয়া ধরে। ক্ষুদ্র বানরটি ইহা দেখিয়া বৃহদাকার বানরকে এ প্রকার আঁচড়াইতে ও কামড়াইতে লাগিল যে, সে জ্বালায় অস্থির

হইয়া রক্ষককে ছাড়িয়া দিল। কোন সম্ভ্রান্ত ইংলণ্ডীয় ললনা লিখিয়াছেন “আমার ইয়ারিকো নাম্নী একটী কুক্কুটী ছিল। যখন এক বৎসর বয়ঃক্রম তখন তাহার প্রায় দশ বারটি শাবক হইয়াছিল। ইয়ারিকো শাবকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে বাস করিত। আমি প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে যাইতাম ও তাহাকে আহার দিতাম। এক দিন প্রাতঃকালে গিয়া দেখি একটা শৃগাল ইয়ারিকোর শাবকগুলি আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু ইয়ারিকো তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া শৃগালের সম্মুখে পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছে। তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হইল যেন সে শৃগাল-হস্তে আপনার জীবন হারাইবে তথাপি প্রাণাধিক শাবকগুলিকে লইতে দিবে না। আমি তৎক্ষণাৎ আমার কুক্কুরকে ইঙ্গিত করিলাম। কুক্কুর মহাবেগে গিয়া শৃগালকে ঐ দুঃসাহসের উপযুক্ত প্রতিফল দিল এবং ইয়ারিকো ও তাহার শাবকগুলির প্রাণরক্ষা করিল। এই ঘটনার পরে দেখিলাম ইয়ারিকোর সহিত আমার কুক্কুরের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হইয়াছে। ইয়ারিকো কুক্কুরের নিকট এই উপকারসূত্রে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞ। এই সময় হইতে উভয়ে এক সঙ্গে আহার করিত, এবং এক সঙ্গে ভ্রমণ করিত। কিছু কাল পরে ইয়ারিকোর শাবকেরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল তখন তাহারা ঐ উপকারক কুক্কুরের বাস-স্থানে দিবারাত্রি পড়িয়া থাকিত। ইয়ারিকো ও আমার কুক্কুরের মধ্যে যে দৃঢ় সদ্ভাব, প্রীতি ও ভালবাসা হইয়াছিল তাহা তাহাদিগের ভাবব্যঞ্জক তরল দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইত।” এই বৃত্তান্তটী পাঠ করিয়া পশুদিগের মধ্যে যে স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, বন্ধুত্ব ও প্রণয় নাই একথা বোধ হয় আর কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না। হেনকক্ নামক কোন এক প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিত বলেন যে, হঙ্গারফোর্ডে নগরে একদা কোন ভদ্রলোক নিজ ভদ্রাসনের প্রাঙ্গণের মধ্যে শকট পরিচালনা করিতেছিলেন। অসাবধানতা নিবন্ধন তাঁহার পালিত কুক্কুরটির পদের উপরিভাগ দিয়া শকটের চক্রনেমি চলিয়া যায়। তখন তিনি কুক্কুরকে একস্থানে বন্ধন করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। কুক্কুরটি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তাহার এই যন্ত্রণা দেখিয়া একটি কাক তাহার নিকটে আসিয়া করুণকণ্ঠে চিৎকার করিতে লাগিল। এই কাকটি প্রত্যহ ঐ কুক্কুরকে ভক্ষণার্থে মাংসপিণ্ড ও অস্থিখণ্ড আনিয়া দিত। এদিকে ক্রমশঃ কুক্কুরটির মৃত্যুকাল আসন্ন হইতে লাগিল। তখন ঐ কাক আহারান্বেষণ ব্যতীত কিয়ৎক্ষণের জন্যও তাহাকে ছাড়িয়া যাইত না। একদা সন্ধ্যার পর কাকের আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল, ইত্যবসরে কুক্কুররক্ষক গৃহ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। কাক ইহার অব্যবহিত পরে আসিয়া দেখিল গৃহ-দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। তখন সে দ্বারের নিম্নভূমি ঠোঁট দিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি ঠোকরাইতে লাগিল এবং একটি বৃহৎ গর্ত্ত করিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময়ে রক্ষক আসিয়া উপস্থিত। সে এই ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এই সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে নিম্নশ্রেণী পশুদিগের দয়া, মমত্ব, করুণা, প্রভৃতি মানব মনের শ্রেষ্ঠ গুণ সকল নিশ্চয়ই আছে।

দুর্ভিক্ষ ও দুর্গোৎসব।

সকলেই জানে ভারতভূমি স্বর্ণপ্রসবিনী। প্রকৃতির যা কিছু সম্পদ এই স্থানেই তাহা বিশেষরূপ বিতরিত হইয়াছে। মৃত্তিকা কোমল, হল-কর্ষণের কষ্ট নাই, অশিক্ষিত

কৃষকেরা বীজ-মুষ্টি নিক্ষেপ করে এবং যথাকালে রাশি রাশি শস্য পায়। তাহাদের পরিশ্রম অপেক্ষাকৃত অল্প। পরিমিত ক্ষেত্রের পূর্ণ শস্য একটী গৃহস্থ সংসারের পূর্ণ সম্পদ। তবে কেন এই স্থানে ব্যাপক কাল দুর্ভিক্ষ থাকে। যাহারা ভারতলক্ষ্মীর সুকোমল ক্রোড়ে সুখে প্রতিপালিত তাদের আজ কেন অন্নাভাব উপস্থিত।

ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমত আমাদের রাজার উপর দৃষ্টি পড়ে। এখনকার রাজা বিদেশীয়। ইহাঁরা বাণিজ্য-সূত্রে এই দেশ অধিকার করিয়াছেন। এক্ষণে শাসন ও বাণিজ্য এই দুইটিই ইহাঁদের কার্য্য। এই ভারতবর্ষ এক এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজার হস্তগত হইয়াছে বটে কিন্তু কোন রাজাই শাসনের সঙ্গে বাণিজ্য লইয়া আইসেন নাই। সেই সমস্ত রাজার অধিকারকালে দেশের অর্থ দেশেই থাকিত, দেশের শস্য দেশেই থাকিত, কিন্তু এখন এই বণিক রাজাদিগের সময়ে অর্থ ও শস্য ভারে ভারে বিদেশে যাইতেছে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই বাণিজ্য-প্রভাবে এতদ্দেশীয় শস্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হইয়াছে তন্নিবন্ধন অনেকে কিছু স্বচ্ছল, কিন্তু এই স্বচ্ছলতা শ্রেণী-বিশেষের, সকলের নহে। যেখানে অন্ন সাধারণের অনায়াসলভ্য হইল না, সেখানে দুর্ভিক্ষ ও হাহাকারের রাজত্ব। ফলত এই বৈদেশিক বাণিজ্যই এতদ্দেশে সেই ভীষণ রাজত্ব গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে এইরূপ নিয়ম ছিল, যে, রাজা দেশ জয় করিতেন, এবং বর্ষে বর্ষে বা এক কালীন কিঞ্চিৎ করসংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া তদ্দেশীয়ের হস্তেই শাসনভার সমর্পণ করিতেন। এইটী এখানকার চিরন্তন সভ্যতম রীতি। কিন্তু এখন ইহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। আমরা দেখিতেছি শাসন এই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজগণের একটী ব্যবসায়। ইহাঁরা দিন দিন দলে দলে দূর দেশ হইতে আসিতেছেন। ইহাঁদের লক্ষ্য এই যে রাজকার্য্যে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া কবে স্বদেশে প্রতিগমন পূর্ব্বক সেই অর্থ নিরুদ্বেগে ভোগ করিবন! এই জন্য যাঁহারা এতদ্দেশীয় উপাদানে নির্ম্মিত, যাঁহারা এতদ্দেশীয় লোকের প্রকৃতি পত্রে পত্রে পাঠ করিয়াছেন, দেশীয়েরা যাঁহাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতার একান্ত পক্ষপাতী, দেশীয়েরা যাঁহাদিগকে উচ্চ-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত দেখিলে এখনও দেবভক্তিতে পূজা দিতে প্রস্তুত আছেন, সেই সমস্ত সুযোগ্য লোককে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা স্বয়ং শাসনভার লইতেছেন। বলিতে কি, এইটি যার পর নাই স্বার্থগন্ধী দূষিত ব্যবহার। ইহার ফল এই এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত লোকের জ্বলন্ত উৎসাহে নিরুদ্যমবারি প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, এতদ্দেশীয় অর্থে বিদেশীয় ভাণ্ডার পূর্ণ হইতেছে, এবং এতৎদেশ ক্রমশঃ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে।

যে দেশের অর্থ ও শস্য গেল তথায় আর রহিল কি? দেশ ত ছারখার হইল। যা কিছু আছে লোকে রাজ-দ্বারে লালায়িত হইয়া যা কিছু সঞ্চয় করিতেছে, রাজা প্রকারান্তরে তাহাও লইতেছেন। এতদ্দেশের সর্ব্বপ্রধান শস্য তণ্ডুল, ইহা কোটি কোটি লোকের ধন ও জীবন। এই তণ্ডুল নিয়ত অমিত ভাবে দেশান্তরে যাইতেছে, এবং ইহা দ্বারা মদ্য প্রস্তুত হইয়া পুনর্ব্বার এই স্থানে আসিতেছে। রাজা ধর্ম্মরক্ষক, কলুষিত ধর্ম্মনীতি তাঁহার উপেক্ষনীয় হইতে পারে না। খৃষ্ট তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, নিষিদ্ধ পান বিষবৎ পরিত্যাগ কর, কিন্তু এই বণিক রাজা সেই বাক্যে উপেক্ষা করিয়া কেবল স্বার্থের

প্রবর্ত্তনায় ঘৃণিত সৌণ্ডিক-বৃত্তি আশ্রয় করিয়াছেন, এতদ্দেশীয়দিগকে ধনে প্রাণে মজ্জাইবার জন্য কলশে কলশে মদ্য আনিতেছেন এবং তল্লব্ধ শুল্কে রাজ-কোষ পূরণ করিতেছেন। এতদ্দেশীয় লোক কাল-মহিমায় যদিও নিস্ব কিন্তু উষ্ণপ্রধান-দেশ-মাহাত্ম্যে আমোদপ্রিয়। ইহাঁরা যথাসর্ব্বস্ব বিনিময় করিয়া এই তীব্র মাদক ক্রয় করিতেছেন। এদিকে তাঁহাদের গৃহ-লক্ষ্মী ছিন্নবসনা অন্নাভাবে দীনা ও মলিনা, ক্রোড়ের অবোধ শিশু ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কাঁদিতেছে, কিন্তু এই বলদেবের শিষ্যগন নিতান্ত হতচেতন, স্ত্রী পুত্রের অন্নকষ্টে ভ্রুক্ষেপও করেন না। ফলত এদেশে দুর্ভিক্ষের যা কিছু অবশেষ এই মদ্যই তাহা আনিয়া দিল।

পূর্ব্বে এখানকার এইরূপ রীতি ছিল যে কি ধনী কি গৃহস্থ শস্যের বার্ষিক ব্যয় সঙ্কুলন হইয়া যা কিছু অবশেষ থাকিত তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিত। কিন্তু এখন আর তাহা থাকে না। এখন শস্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়াছে সুতরাং অর্থ-লোভে সকলেই শস্য বিক্রয় করেন। একেত অর্থ কৃচ্ছ্র, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আবার অনেক সময় শস্য পাওয়া যায় না, সুতরাং দেশের সর্ব্বত্রই অন্নকষ্ট উপস্থিত।

এখন বিজ্ঞান-বল পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুলভসঞ্চার করিয়া দিতেছে। চক্ষের এক পলকে বহু দিনের পথ পর্য্যটন করা যায়। মনে কর, বিদেশে দুর্ভিক্ষের অনল জ্বলিয়া উঠিল। তজ্জন্য এই ভারতবর্ষ হইতে বাষ্পীয় যানে প্রচুর পরিমাণে শস্য চলিল, কিন্তু বলিতে কুণ্ঠিত হই, যে দেশের বালকেরাও ভিক্ষুককে স্বয়ং মুষ্টিভিক্ষা দিয়া শৈশব কাল হইতেই দয়া শিক্ষা করে, সে দেশের লোক এত অনুদার নয়, এত স্বার্থপর নয়, যে এক স্থানে কোটি কোটি লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিবে, আর ইহারা পরম সুখে মুখে অন্নের গ্রাস তুলিবে। যাক্, তথায় এতদ্দেশের শস্য গিয়া সকলের দুর্ভিক্ষ দূর করুক। ভারতের শস্য এত সুপ্রচুর যে এদেশে পর্য্যাপ্ত হইয়া বিদেশকেও রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু একটা কথা বলি, ভারতবর্ষের তণ্ডুল ইউরোপে গিয়া যে অসংখ্য অসংখ্য শূকরের উদর পূরণ করিতেছে, এবং সেই তণ্ডুলে যে সাক্ষাৎ কালকূটস্বরূপ তীব্র মাদক প্রস্তুত হইতেছে ইহাতে আমাদের বিশেষ লাভ কি।

যাহাই হউক, এক্ষণে এই সমস্ত কারণে ভারতবর্ষে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এতৎব্যতীতও দুর্ভিক্ষের স্থানীয় কএকটী কারণ আছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশই হ্রাস হইয়া থাকে। ফলত এইটি অকাট্য কথা! কোন এক ক্ষেত্র যদি ক্রমান্বয়ে কএক বৎসর ব্যবহার করা যায় তাহাতে শস্য ক্রমশই অল্প হইবে। কিন্তু যেরূপ সময় উপস্থিত কেহ সাহস করিয়া ক্ষেত্রে বিরাম দিতে পারেন না; ভূমির যে তেজটি নষ্ট হইল তাহার পুনঃসঞ্চয়ে আর কেহই কালবিলম্ব করিতে পারেন না। এদিকে এদেশের সকল স্থলে ভূমিতে সার দিবারও তাদৃশ ব্যবস্থা নাই, সুতরাং ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইতেছে। যেমন ভূমির শক্তিহ্রাস হইতেছে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং এতদ্দেশে দুর্ভিক্ষ যে ক্রমশঃ স্থায়িতর আকার ধারণ করিবে এখন তাহার সূত্রপাত।

দ্বিতীয় জলাভাব। আমাদের দেশ দেবমাতৃক। রাজা আজিও ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বত্র কূপাদি খনন করিয়া দেন নাই। সুতরাং আমাদিগকে চাতকের ন্যায় প্রায়ই মেঘের প্রতীক্ষা করিতে হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এইরূপ জলাভাবের একটী কারণ অনুমান করেন। তাঁহারা কহেন

যে, এক্ষণে ভারতবর্ষের নিবিড় অরণ্য সকল লোকালয় হইতে বহুদূরে, নিকটের অধিকাংশই নির্ম্মূল হইয়াছে। যে সকল ভূমি ঘনীভূত বনে আচ্ছন্ন ও আর্দ্র তাহা হইতে বাষ্পরাশি অনবরত উত্থিত হইয়া মেঘ প্রস্তুত হয়। কিন্তু এখন তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। বন বহুদূরবর্ত্তী তজ্জন্য আর তাদৃশ মেঘ দেখা যায় না সুতরাং এতদ্দেশে প্রায়ই অনাবৃষ্টি।

তৃতীয় ধর্ম্মনিষ্ঠার অভাব। বিধি-নিষেধ পালন করাই নিষ্ঠা; ইহাই ধর্ম্মের জীবন। কিন্তু এখন দেখা যায় লোকের আর তাদৃশ ধর্ম্মনিষ্ঠা নাই। নিষিদ্ধ গমন ও নিষিদ্ধ পানভোজনে অনেকেই প্রবৃত্ত। এই দুঃস্বভাবে অনেক পরিবার ঋণগ্রস্ত হইয়াছে, অনেক পরিবার ছারখার হইতেছে। যিনি বিকশিত মল্লিকা পুষ্পের ন্যায় সৌরভে সকলকে পুলকিত করিতেন এই দুঃস্বভাব তাঁহাকে মস্‌ণ ও ম্লান করিতেছে। তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের অর্দ্ধাংশ তাঁহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করে, সুতরাং তিনি অবসন্ন।

এক্ষণে এই সমস্ত কারণে ভারতবর্ষে সর্ব্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। হিন্দুদিগের ব্যবহার-শাস্ত্র পাঠে দেখা যায়, যে রাজদোষে এতদ্দেশে দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। যেখানে প্রভুত্ব ও শক্তি সেইখানেই স্বার্থ; এই কারণে সর্ব্বাধিপতি রাজা স্বার্থপ্রিয় হইয়া থাকেন। শাসন ও স্বার্থসাধন তাঁহার কার্য্য। কিন্তু পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণে ইহার ব্যভিচার দেখা যায়। এই ব্যভিচারের কারণ এতদ্দেশীয় সংহিতাকার। তাঁহারা জানিতেন যেখানে প্রভুত্ব ও শক্তি সেই খানেই স্বার্থ; এই জন্য তাঁহারা শাসনের সহিত ধর্ম্মের একটী দৃঢ়তর যোগ স্থাপন করিয়া দেন। কিন্তু মানবপ্রকৃতি স্বার্থপ্রবণ; সে সময়ে সময়ে ধর্ম্মসেতু লঙ্ঘন করে। সংহিতাকারেরা এই জন্য প্রাড়্‌বিবাককে রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী করিয়া দিয়াছেন। এই প্রাড়্‌বিবাক ব্রাহ্মণ ব্যবহার-কালে রাজার নিরঙ্কুশ ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতেন, ইনি রাজার ধর্ম্মদৃষ্টি বর্দ্ধন করিতেন এবং প্রজাবাৎসল্য শিক্ষা দিতেন। ফলত এই ধর্ম্মের শাসন-বলেই হিন্দুরাজা নিঃস্বার্থ ছিলেন। তিনি সহস্র গুণ দিবার নিমিত্ত প্রজার নিকট যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতেন এবং আত্মসুখ অপেক্ষা প্রজার সুখে অধিক দৃষ্টি রাখিতেন। এই জন্য এই ভারতবর্ষে রাজদোষে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইত না।

কিন্তু আজ এই ভারতের কি দুরবস্থা! সমুন্নত হিমাচল যাহার শিরোদেশ, কাশ্মীর যাহার শ্রবণাবতংস, সিন্ধু যাহার আনন্দাশ্রুধারা, গঙ্গা ও নর্ম্মদা যাহার হৃদয়-ধমনী, গলকণ্ঠ-হীরকখনি যাহার মেখলা—স্বর্ণময়ী লঙ্কা যাহার পাদ-শিঞ্জিনী—এবং পদ্মপরিমলই যাহার বদন-সুরভি, সেই ভারতলক্ষ্মীর ক্রোড়ে আজ সকলে অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। এক পদ বহির্গত হও দেখিবে, চতুর্দ্দিকে কেবলই শোকতাপের দীর্ঘ নিশ্বাস, ক্ষুধাতৃষ্ণার আর্ত্তস্বর। কোন স্থানে কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া আছে, কেহ স্তব্ধ শূন্যগৃহে মৃতপ্রায়, কেহ পাণ্ডুবর্ণ অস্থিসার দেহ লইয়া শয়ান; সে ক্ষীণ ও অবশ হস্তে ভক্ষ্যলোলুপ শৃগাল কুক্কুরকে একএক বার তাড়াইতেছে। মনুষ্য মনুষ্যের মাংসে ক্ষুধার জ্বালা শান্তি করিতেছে। স্থানে স্থানে মৃত মনুষ্যের কঙ্কাল-রাশি যেন এই কাল-সঙ্কটের স্মৃতিস্তম্ভ। বৃক্ষলতা পত্র শূন্য এবং প্রান্তর মরুভূমির ন্যায় ধুধু করিতেছে। ভারতের চতুর্দ্দিকে কেবলই এই শোচনীয় দৃশ্য। এখন দুর্ভিক্ষ ক্রমশই ব্যাপক হইতেছে। এই জ্বলন্ত চিতানলের উষ্মা সকল দেশ স্পর্শ করিতেছে। প্রত্যেকের হৃৎপিণ্ড বাতকম্পিত

দীপ-শিখার ন্যায় স্পন্দিত হইতেছে। ভবিষ্যৎ ঘনান্ধকার, দুর্ভিক্ষ দুর্নিবার, ইহা বর্ষে বর্ষে ঘটিতেছে, ইহা বর্ষে বর্ষেই ঘটিবে।

"কালরজনী আঁধারিল এ ভারত; এ
ঘোর বিপদে দেখ চেয়ে করুণানিধান।
দিবারাত জলে ঘোর শোকানল, রাশি
রাশি চিতা সঙ্গে, দেখ চেয়ে করুণানিধান।"

সম্মুখে দুর্গোৎসব। এ সময় হিন্দুজাতির মন পূর্ণকল শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় স্বচ্ছ ও সরল। চিত্তের সুকোমল বৃত্তি সকল জাগ্রত হইয়াছে। কেহ অতি স্নেহে সকলের প্রতি বৎসল, কাহারও কৃপাদৃষ্টি পরদুঃখে তরল। সকলের ভক্তিবৃত্তি উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, কার্য্য ঔদার্য্যব্যঞ্জক, স্ব-পর-চিন্তা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইতেছে। হরিশ্চন্দ্র ও রঘুর পবিত্র রক্ত যে জাতির শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত, এখন সেই জাতি অনাথ দীন দরিদ্রে মুক্তহস্ত হইবে, এবং নির্ব্বিশেষে দয়া ও দাক্ষিণ্য বিতরণ করিবে। দুর্ভাগ্যের ক্রীড়নক অসহায় দরিদ্র সকল দ্বারে দ্বারে সাদরে প্রবেশ পাইবে। এখন মঙ্গল-তূর্য্যে ভারতের দুঃখ-রজনী সুপ্রভাত হইল, এই পবিত্র ক্ষেত্রে এখন ধর্ম্মোৎসব। এই প্রশংসনীয় ব্যাপার সম্পদের বিলাস নহে ইহা হৃদয় ও সাধু ইচ্ছার বিকাশ। আমরা সর্ব্বাংশেই এই সংভাব টুকুর অনুমোদন করি। কিন্তু মনুষ্যের স্বাভাবিক অন্ধ ভাব সকল-কার্য্যে শ্রী সৌন্দর্য্য রাখিতে পারে না। সুতরাং সময়ে সময়ে স্পৃহনীয় পবিত্রতাও অপকলঙ্কে মলিন হয়। যে মহোৎসব হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত একটী জাতিকে মাতাইয়া তুলে,* যে মহোৎসব দিবসত্রয় মাত্র স্থায়ী হইলেও সংবৎসরকাল একটি জাতির ধর্ম্ম ও পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে, তাহা স্থানবিশেষে কুৎসিত ও কদর্য্য আকার ধারণ করিতেছে। দেখিতেছি যেখানে কেবল মাত্র ধর্ম্মের নির্জ্জীব মূর্ত্তি বিরাজমান, সমাজ-শাসন নামমাত্র সেই সমস্ত স্থানে ধর্ম্মোৎসব ব্যপদেশে কেবলই অবৈধ অনুষ্ঠান হয়। কে কোথায় জানে যে দুর্গোৎসবে মদ্যের সদাব্রত দিতে হইবে, কে কোথায় জানে যে দৈব কার্য্য অশ্লীল নৃত্যগীত ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ হয় না, কে কোথায় জানে যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই ধর্ম্মোৎসবের লক্ষ্য। বর্ষে বর্ষে সকলকে চমকিত করিয়া বহ্বাড়ম্বরে এই সমস্ত অসৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। আমরা এই জন্য এই শারদীয় ধর্ম্মোৎসবে দুঃখিত, এই জন্য প্রাণ ভরিয়া ইহার প্রশংসা করিতে পারি না। এখন ঘরে ঘরে ক্ষুধা তৃষ্ণার অর্ত্তনাদ, যদি এক দিনের জন্যও এই অর্থ লোকের জঠর-জ্বালা শান্তি করে, তবে তাহার ফল অনন্ত, তাহার ফল স্বর্গ, তাহার ফল মোক্ষ।

মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ইউরোপের উপকার সাধন।

৪২১ সংখ্যক পত্রিকার ৮৭ পৃষ্ঠার পর।

আরবেরা কঠোর দর্শন ও বিজ্ঞানের অনুশীলনেই বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এজন্য যে কাব্য প্রভৃতি সাধারণ সাহিত্যের অন্তর্ভূত সরস ও সুকোমল বিষয়ের আলোচনা করিতেন না তাহা নহে। স্পেন দেশীয় আরবদিগের মধ্যে সকলে কবিতা রচনা করিতে পারিত; এমন কি, করডোবা ও গ্রানাডার শাসনকর্ত্তা হইতে সামান্য কৃষকের পর্য্যন্ত ঐ শক্তি ছিল। তৎকালে বীররসাত্মক কবিতা ও নাটক লিখিবার প্রথা ছিল না তজ্জন্য তাঁহাদিগের কবিতা গভীর ও মহদ্ভাবপূর্ণ হইত না বটে কিন্তু তাহা সাতিশয় সুকুমার, মনোরম, করুণ ও শ্রুতিমধুর হইত। আরবেরা গ্রীক কবিদিগের গ্রন্থ অধিক পাঠ

---

* ভারতবর্ষের নানা স্থানে দুর্গোৎসব ও যেখানে মূর্ত্তি পূজা না হয় সেখানে নবরাত্রি বলিয়া একটী উৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

করেন নাই বলিয়া, কাব্য শাস্ত্রে সেরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। কেরো ও ডামাস্কাস নগরের প্রস্তরময় অট্টালিকা যে সকল গীত দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন প্রতিধ্বনিত হইত তাহা এই কালের বহু পূর্ব্বে ভীষণ আরব মরুভূমিতে যে সমস্ত গীত গীত হইত তদপেক্ষা অধিক উন্নত ও পরিমার্জিত ছিল না। আরবদিগের বিরচিত অসংখ্য আখ্যায়িকা ও উপন্যাস কাব্যমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। আরব্য উপন্যাস নামক বিখ্যাত পুস্তক তাহার সর্ব্বোত্তম আদর্শ। এই আরব্য উপন্যাস যদিচ অত্যুক্তি দোষে দূষিত কিন্তু সুরসিকতা ও সুকল্পনায় লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।

আরব পুরাবৃত্ত লেখকেরা যেরূপ সংখ্যায় অধিক সেরূপ গুণ-সম্পন্ন ছিলেন না। কেবল স্পেন দেশে যে সকল পুরাবৃত্ত-লেখক জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদিগের সংখ্যা ত্রয়োদশ শত। তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থে বিচার শক্তি ও কার্য্যকারণ অনুসন্ধানের অভাব, গুণশূন্য রাজাদিগের অপরিমিত চাটুকারিতা এবং ধর্ম্ম বিষয়ে নিতান্ত অনুদারতা ভূরি পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ফলত তাঁহারা রাজগণের সামান্য স্তুতিবাদক মাত্র ছিলেন, এই সকল কারণে আধুনিক পাঠকেরা তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠে কোন আমোদ প্রাপ্ত হন না।

যে সকল ব্যবহারিক শিল্প দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যের সুখ সচ্ছন্দতা সাধিত হয়, বিজ্ঞান-চর্চ্চার উদ্যম সেই সকল শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধনের হেতু হইয়া উঠে। ভূমির উর্ব্বরতা ও উৎকর্ষতা সাধনের জন্য স্পেন দেশে জলসেচন কার্য্য অতি পরিপাটী ও সুপ্রণালী ক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে স্পেনের যে সকল স্থান আদিম মরুভূমিতে পরিণত দৃষ্ট হয় তৎসমুদায় তদ্দেশবাসী বহুসংখ্যক লোকের উপজীবিকার উপায় হইয়াছিল। খর্জ্জুর, কার্পাস, ও ইক্ষু প্রভৃতি অতি উপকারী বৃক্ষ সকল আরবেরা স্পেনে প্রথম রোপণ করেন, এবং আফ্রিকা মহাদেশে ও স্পেনস্থ এণ্ডালুসিয়া প্রদেশে অত্যুৎকৃষ্ট আরব্য ঘোটক তাহারদিগেরই দ্বারা আনীত হইয়া ক্রমে তত্তৎদেশে স্বভাবজাত পশুশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া উঠে। কাসিরি নামক এক আরব পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন যে খ্রীষ্টিয়ানেরা যখন বারুদের ব্যবহার জানিয়াছে তাহার দুই শতাব্দী পূর্ব্বে আরবেরা তাহার ব্যবহার জানিত; তুলা ও শনের প্রস্তুত কাগজ খ্রীষ্টিয় শকের ১০০৯ এবং ১১০৬ অব্দে তাঁহাদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইত। টোলিডো, ফেরি ও দামাস্কসের তরবারি, গ্রানাডার কার্পাস ও কৌশেয় বস্ত্র, এবং কর্ডোবা ও মরোক্কোর শোভন চর্ম্ম মাধ্যমিক কালে অদ্বিতীয় রূপে পরিগণিত হইত। খনি-খনন কার্য্যে স্পেন দেশীয় আরবেরা অতিশয় পটুতা লাভ করেন। এক্ষণে কেবল জেয়েন নামক ক্ষুদ্র প্রদেশে পঞ্চ সহস্র খনির চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্পেন দেশীয় কালিফদিগের রাজকোষ এই খনিজ স্বর্ণ ও রৌপ্যে কিরূপ স্ফীত হইয়াছিল তাহা ইহাতেই বিলক্ষণ অনুমিত হইতে পারে।

প্রত্যেক নৈসর্গিক সুবিধার শ্রমসাধ্য উন্নতি সাধনে এরূপ ধন-সৌভাগ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল যে যদি তৎকালিক পুরাবৃত্ত লেখকেরা তাহার সাক্ষ্য প্রদান না করিয়া যাইতেন তবে তাহা আমাদিগের কল্পিত বলিয়া বোধ হইত। বোগদাদের কালিফ মহাধন এলমানসর তাঁহার সকল যুদ্ধকার্য্য এবং অট্টালিকা নির্ম্মাণ পরিসমাপ্ত করিয়া পরিশেষে মৃত্যুকালে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা রাখিয়া যান। কিন্তু কএক বৎসরের পর এই প্রভূত ঐশ্বর্য্য তাঁহার সন্তানদিগের পুণ্য অথবা পাপে সমগ্র নিঃশেষিত হয়। তাঁহার পুত্র মেহদী একবার

তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ষাট লক্ষ মোহর ব্যয় করেন। বোগদাদ হইতে মক্কা প্রায় সাড়ে তিন শত ক্রোশ ব্যবধান; এই সুদূর পথের স্থানে স্থানে তিনি পান্থনিবাস ও জলপ্রস্রবণ প্রস্তুত করিয়া দেন। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিই এই কার্য্যের প্রবর্ত্তক সুতরাং ইহা নিন্দনীয় নহে। কিন্তু একবার তুষারবাহী অসংখ্য উষ্ট্র কেবল গ্রীষ্ম-প্রধান আরব দেশের লোককে বিস্মিত করিতে এবং রাজভোগ্য ভোজের ফল মূল ও মদ্য সুশীতল করিতে প্রচুর ব্যয়ে লইয়া যাওয়া হয়। আলমামুন মেহদীর পৌত্র। তিনি একদা অশ্ব হইতে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে একটি প্রদেশের লব্ধ করের পঞ্চমাংশের চতুর্থাংশ চব্বিশ লক্ষ মোহর বিতরণ করিয়াছিলেন। এরূপ বদান্যতা কেবল তাঁহার চাটুকারগণ দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ঐ রাজার বিবাহকালে কন্যার মস্তকে এক সহস্র স্থূল স্থূল মুক্তাফল বর্ষিত হইয়াছিল, এবং অসংখ্য ভূমিখণ্ড ও বাটী সরতি দ্বারা প্রদত্ত হইয়া ভাগ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর অব্যবস্থিততা ও অস্থৈর্য্য মাত্র প্রকাশ করা হইয়াছিল।

আমরা কেবল স্পেন রাজ্যের অবস্থা অবগত হইলে, ইহা যে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল সেই সাধারণ আরব সাম্রাজ্যের অবস্থারও কিঞ্চিৎ জানিতে পারিব। দ্বিতীয় হাকেমের রাজত্ব কালে স্পেনের কর্ডোবা নগরে দুই লক্ষ বাটী, ছয় শত মসজিদ এবং নয়শত স্নানাগার ছিল। এই সমস্ত মসজিদের মধ্যে যেটী সর্ব্ব-প্রধান তাহার এক সহস্র স্তম্ভ বহুমূল্য প্রস্তরে প্রস্তুত ছিল; এবং উহার ছাদও কারুকার্য্যে আশ্চর্য্যরূপ চিত্রিত ও সুগন্ধি কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতি দিবস সন্ধ্যাকালে প্রার্থনার সময় উহাতে দুই সহস্র বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হইত। ঘাট, জলপ্রণালী, প্রস্রবণ, চিকিৎসালয় যাহা কিছু স্পেন রাজ্যের তৎকালীন রাজধানীর সৌন্দর্য্য ও তৎনগরবাসীর সুখ-সচ্ছন্দতা সম্পাদন করিত তাহা ওমিয়াবংশীয় কালিফদিগের অর্থে প্রস্তুত হইত। কর্ডোবা নগর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে এক সুরম্য উদ্যানের মধ্যে জাহারা নামক একটী রাজবাটী ছিল। এই রাজবাটীতে বহুমূল্য প্রস্তরের অসংখ্য খিলান ছিল, এবং ইহার মধ্যস্থিত সভাভবন স্বর্ণ ও মণি মুক্তায় খচিত ছিল। এই বাটীর মধ্যে মহোজ্জ্বল পারদের প্রস্রবণ দৃষ্ট হইত। ফলতঃ এই রাজবাটী আরব ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ ছিল। কিন্তু হায়! তাহা এক্ষণে ক্ষণকালস্থায়ী কুজ্ঝটিকার ন্যায় বিলীন হইয়াছে। স্পেনের পশ্চিমস্থ কালিফের শাসনে আশিটী বৃহৎ নগর এবং তিন শত উপনগর ছিল। গোয়ালকুইবার নদীতীর দ্বাদশ সহস্র গ্রাম ও উপগ্রামে পরিপূর্ণ ছিল; এই কালিফের বার্ষিক আয় প্রায় ছয়কোটি টাকা এবং তাঁহার শরীররক্ষার্থে দ্বাদশ সহস্র সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত ছিল।

ক্রমশঃ

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত।)

৪২১ সংখ্যক পত্রিকার ৯২ পৃষ্ঠার পর।

(১১০)

(রিপুদমন ও ধর্ম্মসাধন বিষয়ক)

ইহা একটী মহৎ সংগ্রাম, ইহা একটী দেবোচিত কার্য্য, ইহা স্বাধীনতা এবং একটী রাজ্য লাভ জন্য চেষ্টা। এক্ষণে ঈশ্বরকে স্মরণ কর এবং নাবিকেরা ঝটিকা সময়ে কেষ্টর এবং পোলক্স * নামক দেবতাদ্বয়ের সাহায্য যেমন প্রার্থনা করে তেমনি তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা কর।

ইপিক্টিটস

---

* গ্রীক অশ্বিনীকুমার।

(১১১)

হে পরমাত্মন্! যাহা তোমার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই দিকে আমাকে লইয়া যাও, আমি প্রফুল্লচিত্তে তোমার অনুগমন করিব। অত্যন্ত অনিচ্ছু হইলেও যখন সেই দিকে যাইতেই হইবে তখন আহ্লাদিত চিত্তে কেন না যাইব?

ঐ

(১১২)

সকল বস্তু ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, এবং ঈশ্বরের সাহায্য ও প্রভাবশূন্য হইয়া যদ্যপি একাকী থাকে তাহা হইলে কোন বস্তু স্বকীয় প্রকৃতি রক্ষা করিতে পারে না।

ডিমণ্ডো নামক গ্রন্থ প্রণেতা

(১১৩)

যেমন রাজনিয়ম নিজে নিশ্চল হইয়া পৌরজনদিগকে পরিচালন পূর্ব্বক সকল বিষয় নিয়মিত করে সেই রূপ ঈশ্বর নিজে নিশ্চল হইয়া সকল বস্তু পরিচালিত করেন।

ঐ

(১১৪)

ঈশ্বর ক্ষেত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করেন অর্থাৎ পরিমাণ-অনুসারে সকল কার্য্য করেন।

প্লুটার্ক

(১১৫)

সঙ্গীতের নিয়মানুসারে সকল বস্তু ঈশ্বর দ্বারা কৃত হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহার কার্য্য সকলে সম্পূর্ণ মিল ও সামঞ্জস্য দেখা যায়।

ঐ

(১১৬)

ঈশ্বর সৌন্দর্য্য-সমুদ্র।

প্লেটো ও প্লুটার্ক

(১১৭)

যেমন বিজ্ঞ নাবিক জাহাজকে পরিচালনা করে, তেমনি সর্ব্বাধ্যক্ষ ঈশ্বর সমস্ত দ্যুলোক ও মর্ত্ত্যলোক পরিচালনা করিতেছেন।

ডায়োমক্রানইসিসট।

(১১৮)

ঈশ্বর সমস্ত কালের প্রভু, তিনি সারাৎসার।

ঐ।

(১১৯)

সর্ব্বনিয়ন্তার বিষয়ে কি বর্ব্বর কি সুসভ্য গ্রীক, সকলের মনে স্বাভাবিক ভাব সংস্থিত আছে, তাহা কোন মানবীয় শিক্ষকের নিকট হইতে তাহারা প্রাপ্ত হয় নাই।

ঐ।

(১২০)

প্রকৃত ধর্ম্ম বলিদান অথবা গন্ধদ্রব্য প্রদানের উপরে নির্ভর করে না, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও করুণা নিজে স্বীকার করা, এবং তৎপরে তাহা অন্যের নিকট ঘোষণা করার প্রতি নির্ভর করে। ঈশ্বর ঈর্ষাপরবশ না হইয়া যে বস্তুকে যত উৎকৃষ্ট করিতে পারেন, সেইরূপ উৎকৃষ্ট করিয়া যখন জগৎকে সুশোভিত করিয়াছেন, তখন তিনি কূটস্থ রূপে মঙ্গল স্বরূপ ইহা প্রমাণিত হইতেছে, অতএব তিনি মঙ্গলময় বলিয়া আমাদিগের দ্বারা কীর্ত্তিত হউন। এবং সকল বস্তু কি প্রকারে শোভন হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার ক্ষমতা যখন তাঁহার আছে, তখন তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এবং সঙ্কল্পিত বিষয় সকলকে সাধন করিবার ক্ষমতা তাঁহার অসীম শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

গেলেন।

ক্রমশঃ

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০কার্ত্তিক শুক্রবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ন তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

সম্বৎ ১৯৩৫। কলিগতাব্দ ৪৯৮০। ১ আশ্বিন সোমবার।

Registerd No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৪২৩ সংখ্যা কার্ত্তিক ১৮০০ শক। ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বর-প্রেম ও ঈশ্বর-নিষ্ঠা।

ঈশ্বর আমাদিগের স্রষ্টা, তিনি আমাদিগের পিতা, অতএব মনুষ্য স্বভাবতঃ তাঁহাকে প্রীতি করিবে ইহার আশ্চর্য্য কি? যাঁহা হইতে উৎপত্তি ও স্থিতি হইতেছে, যিনি আমাদিগের পিতা, তাঁহাতে প্রীতি না থাকা, ইহা অপেক্ষা অস্বাভাবিক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? যিনি আমাদিগের মনে প্রীতিবৃত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন তাঁহাকে প্রীতি করিব না তবে কাহাকে করিব? নদী যেমন সিন্ধুর অভিমুখে স্বভাবতঃ ধাবিত হয়, পুষ্প যেমন স্বভাবতঃ গন্ধ প্রদান করে তেমনি মোহান্ধকার তিরোহিত হইলে মন স্বভাবতঃ ঈশ্বরকে চায়। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিলে যে কেবল মনের স্বাভাবিক বৃত্তি চরিতার্থ হয় এমন নহে, সেই প্রীতির উপকারিত্ব অসীম। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি স্থাপন না করিলে এই ভয়াবহ সংসারে আমাদিগের আর নিস্তার নাই। ঈশ্বর-প্রীতি সাংসারিক সকল ভয় ও উদ্বেগ হইতে মনকে মুক্ত করিয়া শাশ্বত সুখ প্রদান করে। সেই প্রীতি যদি যথার্থতঃ মনে উদিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ স্বর্গ, তৎক্ষণাৎ মুক্তি, কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম আমাদিগের মনে উদিত হয় কৈ? ধনের প্রতি, আহারের প্রতি আমাদিগের যেরূপ প্রীতি সেরূপ প্রীতি ঈশ্বরের প্রতি উদিত হয় কৈ? অনেকে এই প্রীতির দাবিদার আছে কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমী কয় জন? প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম যদি মনে উদিত হয় তবে তখনি ত সকল জ্বালা নিবৃত্তি হয়, তখনি ত সকল সুখ সম্পদ প্রাপ্ত হই, তখনি ত সকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হই। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম মনে কখন উদিত হয় না। কোন কোন ব্যক্তির মনে একেবারেই প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম উদিত হয়, তাঁহাদিগের আর এ বিষয়ে আয়াস পাইতে হয় না। কেন যে ঈশ্বর সেই সকল ভাগ্যবান ব্যক্তির প্রতি একেবারেই অনুগ্রহ প্রকাশ করেন তাহার কারণ আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহার কার্য্য কে বুঝিবে? ঈশ্বরের কার্য্য ঈশ্বরই বুঝেন। কিন্তু যাঁহাদিগের প্রতি ঈশ্বর এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ না করেন তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে বন্ধু কবে অনুগ্রহ করিবেন এই প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহারা তাঁহার দ্বারে

মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক পড়িয়া থাকেন। তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে স্বাতি নক্ষত্রের জলবিন্দু তাঁহাদিগের আত্মার উপর কখন পতিত হইয়া প্রকৃত ঈশ্বর-প্রীতি রূপ অমূল্য মুক্তাফল উৎপাদন করিবে, এই আশাতে চাতকের ন্যায় আশান্বিত থাকেন। তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিলে তিনি এক সময়ে না এক সময়ে অবশ্যই অনুগ্রহ করিবেন ইহা নিশ্চয় কথা। কিন্তু এই অধ্যবসায় কয় জন লোকের আছে ? হে মন ! যাঁহার বন্ধুর নিকটে যাইবার ইচ্ছা আছে তাঁহার কর্ত্তব্য যে তিনি অধ্যবসায়ারূঢ় হন। যে ব্যক্তি অধ্যবসায়ারূঢ় হয় সে অবশ্য তাহার ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হয়।

পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন।

ধর্ম্ম হইতে মানবাত্মা বিযুক্ত হইয়া কতই পাপাচরণ না করিতেছে ও তন্নিবন্ধন কতই দুঃখক্লেশ না ভোগ করিতেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দুঃখ মনুষ্যের পাপ-জনিত। পৃথিবীতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত কোন না কোন পক্ষের অন্যায়াচরণ হইতে সেই যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কোন জাতি নিরুপদ্রবে আপনাদিগের ধনধান্য ভোগ করিতেছে তাহা দেখিয়া আর এক জাতির লোভের উদয় হইল। সেই লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য সেই জাতি প্রথমোক্ত জাতির সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল। মনুষ্য অন্য মনুষ্যের শরীর অস্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মের চক্ষে আর কষ্টকর দৃষ্টি নাই। সকল মনুষ্য এক পিতার সন্তান ও পরস্পর ভ্রাতা স্বরূপ। কোথায় তাহারা সদ্ভাবে কাল যাপন করিবে,তাহা না করিয়া পরস্পরের প্রতি অত্যাচার ও পরস্পরকে হত্যা করিতেছে। কোন অসভ্য জাতি আপনাদিগের স্বভাবতঃ উর্ব্বর দেশ অল্পায়াসে কর্ষণ পূর্ব্বক তজ্জাত শস্য লাভ করিয়া, তাহা উপভোগ করিতেছে এবং নিরুদ্বেগে আপনাদিগের কুটীরের সম্মুখস্থ তরুচ্ছায়াতে উপবিষ্ট থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত আমোদে কাল যাপন করিতেছে, এমন সময়ে কোন সভ্যাভিমানী জাতি হঠাৎ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগের দেশ অধিকার করিয়া লইল, তাহা অন্যায় ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ করিল, এবং যে পর্য্যন্ত না সেই অসভ্য জাতি একেবারে ধ্বংশ হইল সে পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিল না। পৃথিবীতে একজন আর একজনের সম্পত্তি অন্যায় পূর্ব্বক অপহরণ করিতেছে, একজন আর এক জনের প্রতি অত্যাচার ও তাহাকে পীড়ন করিতেছে এই প্রকার সংবাদ সর্ব্বদাই শ্রুতিগোচর হইয়া মনকে নিরতিশয় ব্যথা প্রদান করে। কত মনুষ্য লম্পটতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পশুবৎ ব্যবহার করিয়া আপনার পবিত্র আত্মাকে কলুষিত করিতেছে। কত লোক স্পষ্ট অত্যাচার অপেক্ষা সহস্র গুণ দোষাবহ সূক্ষ্ম প্রবঞ্চনা করিয়া অন্যের সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে। কত স্থানে নিগুর্ণ পাষণ্ড ধনী গুণবান ধার্ম্মিক নির্ধনের প্রতি গর্ব্বিতাচরণ করিয়া তাঁহাকে যার পর নাই মনস্তাপ প্রদান করিতেছে। পৃথিবীতে নির্দ্দয়তা,নিষ্ঠুরতা,অত্যাচার ও উপদ্রবের আর সীমা নাই। এই সমস্তের কারণ কি? ইহার কারণ মানবাত্মা ধর্ম্ম হইতে বিযুক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। যে পর্য্যন্ত না উহা ধর্ম্মের সহিত অচ্ছেদ্য পবিত্র পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইবে সে পর্য্যন্ত এই সকল বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইতে থাকিবে। যদ্দারা এই শুভ ঘটনা সম্পাদিত হইবে তাহা মনুষ্যের যেরূপ যথার্থ মঙ্গল-সাধক, তাহা ঈশ্বরের যেরূপ মনঃপূত ও প্রিয় এমন অন্য কোন পদার্থ নহে। অনেকে এই কথা বলেন যে

সভ্যতাই মনুষ্যের ধর্ম্মোন্নতি ও সুখসাধনের একমাত্র উপায়। কিন্তু এক্ষণে যে সভ্যতা পৃথিবীর সভ্যতম দেশ সকলে প্রবল তাহা তত ধর্ম্মোন্নতিসাধক নহে, যত বিলাস-সাধক। লৌহবর্ত্ম, তাড়িতবার্ত্তাবহ, দূরশ্রবণী* প্রভৃতি সাংসারিক সুখসচ্ছন্দতা-সাধক যন্ত্র যত আবিষ্কৃত হইতেছে, তত যদ্দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক মনুষ্য হত্যা করা যাইতে পারে, এমত সকল যন্ত্রও সৃষ্ট হইতেছে। এদিকে যেমন সভ্যতা বৃদ্ধি হইতেছে, তেমনি ওদিকে লম্পটতাচরণ, প্রবঞ্চনা ও দরিদ্রতাও বৃদ্ধি হইতেছে। লণ্ডন মহানগরে লর্ডদিগের ইন্দ্র-ভবন-তুল্য প্রাসাদে ইন্দ্রিয়-সুখ ও বিলাসের সীমা নাই। তাহার বহির্ভাগে রাজপথে গৃহহীন রথ্যাবাসী বালক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে। এখনও পৃথিবীর কোন দেশে প্রকৃত সভ্যতার উদয় হয় নাই। ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা। যে সভ্যতাতে শারীরিক ও সাংসারিক সুখ-সাধক উপকরণ সকলই থাকে কিন্তু তাহার উপভোগ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বশীভূত থাকে তাহাই প্রকৃত সভ্যতা। সূত্রধর ও বস্ত্রসীবকেরা সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা নহে। এমন আশা করা যায় যে মঙ্গলময় ঈশ্বরের অনুশাসনে পৃথিবীতে সেই প্রকৃত সভ্যতা ক্রমে অভ্যুদিত হইবেক। বর্ত্তমান বিলাস ও স্বার্থপরতার সভ্যতারূপ পঙ্ক হইতে ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতারূপ পদ্মের প্রকাশ হইবে তাহার চিহ্ন এখনই কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে। এমন এক সময় ছিল যখন নরমাংস ভক্ষণ ও নরবলিপ্রদান-প্রথা সমস্ত পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত ছিল, কিন্তু এক্ষণে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। ক্রীত দাস রাখিবার প্রথাও এক সময়ে ঐরূপ ছিল। ক্রীত দাস রাখিবার প্রথাও এক্ষণে সভ্যতর দেশ সকল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মগ্রন্থ এক বাক্য হইয়া বলেন যে এমন এক সময় অবশ্য আগমন করিবে যখন পৃথিবীতে ধর্ম্মের রাজ্য সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপিত হইবে এবং তাহা নিরবচ্ছিন্ন সুখের আলয় হইবে। কবিরাও সেই অবস্থা প্রতীক্ষা করেন এবং শোভন উজ্জ্বল পদাবলীতে তাহার বর্ণনা করেন। কবে এই ধর্ম্মরাজ্য পৃথিবীতে সংস্থাপিত হইবে, কবে অত্যাচার পরপীড়ন রহিত হইবে, কবে মনুষ্যগণ সৌভ্রাত্র-সূত্রে বদ্ধ হইয়া পরস্পরের উপকার সাধনে সতত যত্নশীল থাকিবে? হে জগদীশ্বর! সেই দিন শীঘ্র আনয়ন কর।

> “শান্তিসুধা সর্ব্বভুবন বিস্তার,
> ইচ্ছা তোমারই হউক সফল হে,
> অনীতি দুর্ম্মতি করি অপহৃত
> পুণ্য-সলিল বরিষ বরিষ অমৃত।”

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

ঋগ্বেদ সম্যক সমালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ বৈদিক সময়ে বিজ্ঞানশাস্ত্রে ধর্ম্মতত্ত্বে এবং সাংসারিক জীবন-প্রণালী বিষয়ে অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। যথা “ক্ষেত্রমিব বিমমুঃ” ১।১১০।৫ ঋক। “মান-দণ্ডের দ্বারা যেরূপ ভূমির পরিমাণ করা যায়, সেইরূপ পরিমাণ করিয়াছিল।’ সূত্রধর এবং শকট-নির্ম্মাণকারীদিগের অত্যন্ত আদর ছিল। পথ প্রস্তুত করিবার প্রথা এবং পথি মধ্যে পান্থ-নিবাসরূপ বিশ্রাম স্থানের অনেক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তত্তৎ স্থানে পথিকদিগের নিমিত্ত খাদ্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইত। অনেকস্থলে স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ প্রভৃতি বিবিধ ধাতুর নাম ও তন্নির্ম্মিত সামগ্রী সকল উল্লি-

---

* Telephone.

খিত আছে। বধ্রিমতী নামে কোন রাজর্ষির পুত্রিকা ক্লীব-ভর্ত্তৃকা হইয়া পুত্রলাভার্থ অশ্বিনদেবকে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে হিরণ্যহস্তাখ্য পুত্র দান করিয়াছিলেন।১।১১৬ ১৩। আর ১।৩৩।৮ ঋক "হিরণ্যেন মণিনা শুম্ভমানা" অর্থাৎ স্বর্ণযুক্ত কণ্ঠবাহু প্রভৃতির মণ্যাদি আভরণ দ্বারা শোভমানা।

ঋগ্বেদের সময়ে বৈদ্যশাস্ত্রও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। জল, বায়ু এবং উদ্ভিজ্জের নানাবিধ স্বাস্থ্যকর উৎকৃষ্ট গুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সোম ওষধিদিগের পতি এবং পীড়ার শান্তিদায়ক (১।২২ ; ১।৯১) অশ্বিনেরা দেববৈদ্য। ইহাদিগকে বিবিধ আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে এবং বধিরত্ব অন্ধত্বাদি উৎকট রোগ আরোগ্য করিতে দেখা যায়। তাঁহারা অন্ধ কণ্বকে চক্ষুদান ও বধির নৃষদপুত্রকে শ্রবণ-শক্তি দান করিয়াছিলেন। রুদ্রদেবও স্বাস্থ্যদাতা এবং বিবিধ পীড়োপশমকারক ওষধি-দাতা। প্রাচীন আর্য্যসমাজে চিকিৎসাশাস্ত্র যে উৎকর্ষ ও খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন আর্য্যগণ উত্তম রূপে রোগ নির্ণয় এবং রোগের সূক্ষ্ম লক্ষণ সমস্ত নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। পথ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অত্রি-প্রণীত আত্রেয়ী সংহিতা প্রথম। হারীত স্বগুরু অত্রিকে রোগের উৎপত্তি এবং চিকিৎসার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে অত্রি প্রায় ১৫০০ শ্লোকে উত্তর দিয়াছিলেন। ইহা আত্রেয়ী সংহিতা। এই সংহিতা অরিষ্টক, চিকিৎসা প্রভৃতি ষড়ভাগে বিভক্ত এবং নানারূপ ব্যাধির নির্ণয় ও প্রতিবিধান বিস্পষ্ট ভাষাতে বিন্যাস করিয়াছেন।

দ্বিতীয়, চরক সংহিতা। ইহা অষ্টবিভাগে এবং ১২০ অধ্যায়ে বিভক্ত। ত্রিংশ অধ্যায় শ্লোকস্থান, অষ্টাধ্যায় নিদানস্থান, অষ্টাধ্যায় বিমানস্থান, অষ্টাধ্যায় শারীরস্থান, দ্বাদশাধ্যায় ইন্দ্রিয়স্থান, ত্রিংশদধ্যায় চিকিৎসা স্থান, দ্বাদশাধ্যায় কল্পস্থান এবং দ্বাদশাধ্যায় সিদ্ধিস্থান, এই অষ্ট বিভাগ। চরক বলেন তিনি এই বিদ্যা আত্রেয়-শিষ্য অগ্নিবেশের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। চরক-সংহিতা অতি সুন্দররূপে গ্রথিত এবং মনোরঞ্জক। ইহা হইতে বহুবিধ উদ্ভিজ্জের গুণ, রোগের নির্ণয় এবং তত্তৎচিকিৎসা-প্রণালী শিক্ষা করিতে পারা যায়।

তৃতীয় সুশ্রুতকৃত আয়ুর্ব্বেদ। সুশ্রুত বিশ্বামিত্র-পুত্র ও চরকের শিষ্য কিন্তু তিনি গুরু অপেক্ষা শল্য এবং শালাক্য বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। অন্তর্ব্বিদ্ধ বাহ্যিক পদার্থের অস্ত্রাদি কোন উপায় দ্বারা বহির্নিঃসারীকরণকে শল্য কহে। চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় প্রভৃতির চিকিৎসার নাম শালাক্য। সুশ্রুতের গ্রন্থে ধাতু-নির্ম্মিত সপ্তবিংশতি প্রকার শস্ত্রের নাম আছে। সুশ্রুতের মতে শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ব্যতীত চিকিৎসাতত্ত্বের সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। বাগ্‌ভট আয়ুর্ব্বেদের টীকাকার। ইনি লিখিয়াছেন যে, শস্ত্রগুলি ছয় ইঞ্চ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গুলী প্রমাণের অপেক্ষা দীর্ঘতর ছিল না। ওয়াইসের হিন্দু মেডিসিন নামক গ্রন্থে বিংশতি প্রকার শস্ত্রের প্রতিরূপ চিত্রিত আছে। এই সমস্ত সত্ত্বেও আত্রেয়, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ যে কোন্ সময় ভারত উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিনিগমনা করিতে পারা যায় না। তথাপি ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্র যে অতিপ্রাচীন কাল হইতে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল তাহার সংশয়াভাব।

বৈদিক সময়ে জ্যোতিষশাস্ত্রেরও সম্যক আলোচনা ছিল। আর্য্যকবিগণ নক্ষত্র গ্রহ

সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং ক্রমে জ্যোতিষবেত্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের পর ভারতে জ্যোতির্ব্বিদ্যার আবির্ভাব হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্যা দ্বারা মনুষ্যের অদৃষ্ট এবং রাজ্যাদির শুভাশুভ গণনা করিতে পারা যায়। ঋগ্বেদে চন্দ্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। সোম নক্ষত্রদিগের ক্রোড়ে স্থাপিত আছেন (৮।৩ সূক্ত) চন্দ্র ও তন্নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র সমূহের গতিপথ এবং আকারের যে তৎকালে সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ হইত তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে এবং ব্রাহ্মণে নক্ষত্রদিগের অনেক উপাখ্যান আছে। প্রজাপতি এবং রোহিণীর পরস্পর প্রণয়সঞ্চার হয়। আর একটী নক্ষত্র রোহিণীকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রজাপতির পৃষ্ঠে এক ত্রিপর্ব্বযুক্ত বাণ নিক্ষেপ করে। সেই হেতু অদ্যাপি প্রজাপতি নক্ষত্রে তিনটী তারা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে ইংরাজীতে "ওরিয়ন্‌স বেল্ট" বলে। অনেক স্থলে মলিম্লুচ অর্থাৎ মলমাসের উল্লেখ আছে। ইহা দ্বারা সৌর ও চান্দ্র বৎসরের গণনার মিল রাখা যায়। আর্য্যগণ যে অমাবশ্যা এবং পূর্ণিমার বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বকালে সময়-নিরূপণের জন্য রাত্রি, চন্দ্র, হিমকাল প্রভৃতি মানরূপে ব্যবহৃত হইত। প্রত্যেক বেদেরই এক এক জ্যোতিষ আছে। জ্যোতিষ বেদের ষড়ঙ্গের একটী অঙ্গ। ইহা বৈদিক কর্ম্মের কালনিরূপণের উপযোগী। জ্যোতিষ বেদের চক্ষুস্বরূপ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে সূর্য্যের উদয়ও হয় না, অস্তও হয় না কিন্তু দিবসান্তে ইহা দুইটী পরস্পর-বিরুদ্ধ কার্য্য করে অর্থাৎ এক স্থানে দিবা ও অন্য স্থানে রাত্রি, সুতরাং যে স্থানে রাত্রি হয় সে স্থানের লোকেরা মনে করে যে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আর অনেক স্থলে জ্যোতিষ বিষয়ক বৃত্তান্ত আছে। সুতরাং আর্য্যগণ যে জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহা সুপ্রতিপন্ন হইতেছে। এস্থলে আর্য্য জাতীয় জ্যোতিষের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আবশ্যক।

কেহ কেহ বলেন নক্ষত্র শব্দটী চীন দেশীয় ভাষা হইতে গৃহীত কিন্তু সেটী বিষম ভ্রম। চীন ভাষাতে সিইউ শব্দে একটী মাত্র তারা বুঝায় কিন্তু সংস্কৃত নক্ষত্র শব্দ তারাসমূহবাচী। জ্যোতিষ বিষয়ে সূর্য্যসিদ্ধান্ত সর্ব্বপ্রথম। পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা মধ্যে ইহার এক অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আকাশে চন্দ্রের ভ্রমণ-পথ সপ্তবিংশতি ভাগে বিভক্ত। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে পৃথিবী স্থির এবং পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুরাশি ক্রমাগত পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ঘুরিতেছে। এই গতি বশত নক্ষত্র গ্রহমণ্ডলকে পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করিতে বোধ হয়। দ্বিতীয় আর্য্যভট্টসূত্র। আর্য্যভট্ট খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পাটনার নিকট কুসুমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁকে ভারতবর্ষের অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রধান উন্নতিসাধক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁর গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। দশগীতিক বা দশগীতিসূত্র এবং এক শত অষ্ট সংখ্যক শ্লোক-বিশিষ্ট আর্য্যাষ্টশত। আর্য্যভট্ট পৃথিবীর গোলত্ব এবং আহ্নিক গতি স্বীকার করিতেন। "এই পৃথিবী মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চভূত-নির্ম্মিত, কদম্বের ন্যায় গোলাকৃতি। যেরূপ জাহাজগামী কোন ব্যক্তি নিজের গমন অনুভব করিতে না পারিয়া পার্শ্বস্থিত বৃক্ষাদির দ্রুতগতি দেখিতে পান, তদ্রূপ এই পৃথিবী ঘুরিতেছে

কিন্তু স্থির আকাশস্থ নক্ষত্রবর্গ আমাদিগের চক্ষে দ্রুতগতি-বিশিষ্ট বোধ হয়। ভপঞ্জর (নক্ষত্র সমূহ) স্থির আছে কিন্তু এই পৃথিবী আপনার মেরুদণ্ডে ঘুরিয়া তাহাদিগের দৈবসিক গতি সম্পাদন করিতেছে।” আর্য্যভট্ট রাহুকে গ্রাহ্য করেন না এবং গ্রহণ বিষয়ে তাঁহার মত নির্ভুল। তিনি বলেন চন্দ্র এবং গ্রহ উপগ্রহগণ স্বজ্যোতির্ব্বিহীন কিন্তু সূর্য্যের প্রতিফলিত জ্যোতিতে সকলেই জ্যোতির্ম্ময়। আর্য্যভট্টের পর জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের অবনতি আরম্ভ হইল। বরাহমিহির এবং ভাস্করাচার্য্য তাঁহার পরবর্ত্তী দুই জন জ্যোতিষবেত্তা ও অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ। বরাহমিহির এক জন মাগধ ব্রাহ্মণ। ইহার গ্রন্থের নাম বৃহৎসংহিতা। ইনি গ্রীক শব্দ অনেক ব্যবহার করিয়াছেন। বৃহৎসংহিতা জাতক বা জন্ম, যাত্রা বা স্থানান্তরে যাত্রা (বা যুদ্ধযাত্রা), বিবাহ প্রভৃতি নানা বিভাগে বিভক্ত। ভাস্করাচার্য্য উজ্জয়িনী নগরে বাস করিতেন এবং বীজগণিত, পাটীগণিত এবং পরিমিতি প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত আর এক জন অঙ্কশাস্ত্রবিৎ। ইহাঁর গ্রন্থের নাম ব্রহ্মগুপ্তসিদ্ধান্ত। ইনি রাহুকে ভিন্ন একটী গ্রহ মনে করিতেন কিন্তু গ্রহণের যেরূপ তত্ত্বনির্ণয় করিয়াছেন তাহা ভ্রমাক্রান্ত নহে। ইহাঁর গ্রন্থে অনেক কুসংস্কার-দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরে আর্য্যদিগের অঙ্কশাস্ত্র ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। বারানসী, দিল্লী (ইন্দ্রপ্রস্থ) মৎস্যদেশ (জয়পুর) প্রভৃতি স্থানে অনেক জ্যোতিষিক বৃহৎ গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। মানসিংহের মানমন্দির জয়পুরে প্রায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায় এ বিষয়ে এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে জ্যোতিশ্চক্রের বর্ণনা আছে। শ্রীপতির রত্নমালা গ্রন্থে রাশিচক্র প্রভৃতির অনেক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ উইলিয়ম জোন্স পণ্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রীকে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উদাহরণ পূর্ব্বক আমরা এই জ্যোতিষ সমালোচনার উপসংহার করিব। “জোন্স জিজ্ঞাসা করিলে পর পণ্ডিত শাস্ত্রী এই উত্তর করিলেন, পৌরাণিকেরা বলেন পৃথিবী গোলাকার নহে, কিন্তু অষ্টপর্ব্বতাবৃত এবং সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য; শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র এবং হিমালয় এই অষ্ট পর্ব্বত। লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিস্, দধি, দুগ্ধ, এবং জল সমুদ্র এই সপ্তসমুদ্র। পৃথিবী সপ্তদ্বীপা; জম্বু, প্লক্ষ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মলি, শাক, পুষ্কর এবং কুশ এই সাতটী দ্বীপ। তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ আমাদিগের বাসস্থান। জম্বুদ্বীপ আবার নববর্ষে বিভক্ত; কুরুবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ, রুমন্বকবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ষ, কেতমালবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, চিনারবর্ষ এবং ভারতবর্ষ। পূর্ব্বোক্ত সপ্তদ্বীপ ব্যতীত আর একাদশটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ইহাদিগকে উপদ্বীপ বলে। যদিও পৃথিবী সপ্তদ্বীপা বলিয়া খ্যাত তথাপি উপদ্বীপবর্গ সমেত অষ্টাদশদ্বীপা। ভূমধ্যভাগে সুমেরু পর্ব্বত দেদীপ্যমান এবং প্রকাণ্ড হস্তিস্কন্ধে আরোহণ করিয়া এক দেবমূর্ত্তি এই অষ্ট লোক রক্ষা করিতেছেন। কেতুর মস্তক রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে বলিয়াই চন্দ্রগ্রহণ হয়। কিন্তু আমরা (পৌরাণিক নহি) বিশ্বাস করি যে পৃথিবী কদম্ব পুষ্পের ন্যায় গোলাকার কেবলমাত্র লবণাম্বু-চতুঃসমুদ্র-বেষ্টিত এবং অসংখ্য দ্বীপ এবং উপদ্বীপপুঞ্জে শোভিত। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে পথ দ্বারা ভ্রমণ করে এবং চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে পথ দ্বারা ভ্রমণ করে এই দুই গমনীয় পথ দুই স্থানে পরস্পর সংলগ্ন হইয়াছে; তাহাদিগের

উচ্চতরটীকে পৌরাণিকেরা রাহু এবং অপটীকে কেতু বলে। এই দুই স্থলে চন্দ্র উপস্থিত হইলেই গ্রহণ হইতে পারে।” উচ্চতর সংযোগস্থান (রাহু) কে ইংরাজীতে চন্দ্রের Asending Node এবং নিম্নতর (কেতু) কে Descending Node কহে।

এই সমস্ত দ্বারা সুব্যক্ত হইতেছে যে আর্য্যদিগের জ্যোতিষশাস্ত্র বৈদিক সময় হইতেই প্রসিদ্ধি এবং প্রামাণিকতা লাভ করিয়াছিল।

ক্রমশঃ

বৌদ্ধ সম্প্রদায়।

অদ্যাবধি পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে প্রায় সে সকল গুলিই তাহাদিগের অভ্যুদয়ের কিছুকাল পরে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অনেকের সংস্কার এই যে বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে সম্প্রদায় নাই। এই সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে না হউক কিন্তু কিছুকাল পরে সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্যেরা রাজ-গৃহ নামক স্থানে একটী সভা স্থাপন করেন। ঐ সভায় পাঁচ শত প্রধান প্রধান বুদ্ধশিষ্য তাঁহাদিগের গুরুর প্রচারিত মত ও নিয়ম সকল নির্ণয় করেন এবং এরূপ স্থির করেন যে যাহারা ঐ সকল মতে বিশ্বাস এবং ঐ সকল নিয়মানুসারে কার্য্য না করিবে তাহারা ধর্ম্মচ্যুত বলিয়া তাঁহাদিগের মধ্য হইতে দূরীভূত হইবে। এই ঘটনার পর এক শতাব্দী কাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে মতবিভেদ ঘটে নাই। পরে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর কতকগুলি পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তাব করিলেন। ইহাঁরা বলিলেন যে যদ্যপি তাঁহারা কাহার নিকট হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করেন, যদ্যপি তাঁহারা জলবৎ তরল কোন রূপ মাদকদ্রব্য সেবন করেন, যদ্যপি তাঁহারা মধ্যাহ্ন কালের পর জল, দুগ্ধ ও দধি পান করেন, যদ্যপি তাঁহারা বস্ত্রাচ্ছাদিত আসনে উপবেশন করেন, এবং যদ্যপি তাঁহারা মঠ ভিন্ন লোকের ভদ্রাসনে দীক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অধর্ম্ম-দোষে দোষী বলা যাইতে পারিবে না। ইহাঁদিগের এই প্রস্তাবে অধিকাংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা সম্মত হইলেন না। কিছুকাল দুই দলে বিলক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডা হইতে লাগিল, পরিশেষে এই সকল পরিবর্ত্তনপ্রিয় বৌদ্ধ অন্য সকল হইতে স্বতন্ত্র হইলেন, এবং কাকন্দক নামে এক জন বিখ্যাত বৌদ্ধের পুত্র যসকে গুরুর পদে বরণ করিলেন। ইহাঁরা ঐ সময়ে বৈশালি নামক স্থানে ইহাঁদিগের মতাবলম্বী বৌদ্ধদিগের একটি সভা স্থাপন করেন। সভাস্থলে প্রায় ৭০০ শত বৌদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভায় ইহাঁরা ধর্ম্ম-মত ও ধর্ম্ম-নিয়ম স্থির করিয়া সাধারণের নিকট বাখ্যা করিয়া দিলেন ও তাহা প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে দুইটি সম্প্রদায় হইল। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায় সম্পূর্ণ রূপে বুদ্ধ দেবের মতাবলম্বী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। বিম্নপেটক* নামক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের দীপবংশ নামক পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে এই নূতন বৌদ্ধ সম্প্রদায় বুদ্ধদেবের উপদেশের বিপরীতাচরণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম কলুষিত ও বিপর্য্যস্ত করিতে চেষ্টা পায়। কালে এই দুই বৌদ্ধ সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে অষ্টাদশটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। এই অষ্টাদশটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে

---

* সংস্কৃত—বিনয়পেটক।

মতভেদ ঘটিয়াছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু এই সম্প্রদায় সকলের মধ্যে যে বিশেষ মতভেদ ঘটিয়া ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিব্বত দেশীয় লামা উপাসক-দল একটি প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়। তিব্বতদেশের নিকটবর্ত্তী নেপালরাজ্যে খ্রীষ্টীয় ছয় শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। ৬৩২ খৃঃ অব্দে তিব্বতের রাজা বৌদ্ধ হন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ সকল লইয়া যান। এই সময়ে রাজার দৃষ্টান্তে তিব্বতদেশবাসী অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধদিগের একটি বিশ্বাস আছে যে তাহাদের গুরুর আত্মায় বুদ্ধদেবের আত্মার আবির্ভাব থাকে। এই বিশ্বাস তিব্বত দেশে বিশেষ রূপে প্রচলিত হইয়া পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে তদ্দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা তাহাদিগের লামা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান গুরুর আত্মায় স্বয়ং বুদ্ধদেব সর্ব্বদা আবির্ভূত থাকেন এইরূপ বিশ্বাস করিতে লাগিল এবং রোমান কেথোলিকেরা যেরূপ পোপকে জ্ঞান করে সেইরূপ তাহারা লামাকে অমোঘ, দুঃখ কষ্টের অতীত, পাপশূন্য, পূর্ণ পবিত্র স্বরূপ, বিবেচনা করিতে লাগিল। ক্রমশ যতই লোকে লামাকে বুদ্ধদেবোচিত সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল, ততই লামা আপনার আধিপত্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং ১৪১৯ খৃঃঅব্দে লামা তিব্বত দেশের রাজা ও তদ্দেশবাসীদিগের গুরু উভয় পদই অধিকার করিলেন। এই রূপে বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রচারিত হইয়া লামার উপাসনার আকার ধারণ করিল, এবং ইহা একটি বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।

জৈন আর একটি প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় ৬০০ খৃঃঅব্দে অভ্যুদিত হয় এবং ১২০০ খৃঃঅব্দ হইতে অবনতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। এই সম্প্রদায় অদ্যাবধি ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। এই ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী। ইহাতে যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্মের কতকগুলি মত আছে তেমনি হিন্দুধর্ম্মেরও দুই একটি মত আছে। অনেক জৈনধর্ম্মাবলম্বী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, প্রভৃতি দেবতার পূজা ও উপাসনা করিয়া থাকে। জৈনধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্মের কতকগুলি মত সংস্কৃত ও কতকগুলি মত বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে। এই ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস এই পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে অতএব তদ্বিষয়ের কোন রূপ প্রসঙ্গ করা এস্থলে আর আবশ্যক বোধ হইল না।

ধর্ম্মনীতি সহজ-জ্ঞানসিদ্ধ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পরকালের অস্তিত্ব, পাপীর দণ্ড ও ধার্ম্মিকের পুরস্কার প্রাপ্তি ধর্ম্মবিষয়ক এই সমস্ত সত্য সহজ-জ্ঞান-সিদ্ধ ইহা তত্ত্বজ্ঞানিরা ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু পরোপকার একটি ধর্ম্ম; পরস্ত্রীগমন একটি মহাপাপ, পরস্বাপহরণ একটি অধর্ম্ম এই সকল বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-নীতি যে সহজ-জ্ঞান-সিদ্ধ তাহা অনেকে স্বীকার করেন না। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে ধর্ম্ম-বিষয়ক সত্য যেরূপ সহজ-জ্ঞান-সিদ্ধ, ধর্ম্ম-নীতিও সেইরূপ সহজ-জ্ঞান-সিদ্ধ। ধর্ম্ম-বিষয়ক সত্য জানিবার জন্য যেমন বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক করে না, ধর্ম্মনীতি জানিবার জন্য সেইরূপ জ্ঞান কিম্বা বিদ্যা আবশ্যক করে না। নিরক্ষর মূর্খেরা যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাঁহার পবিত্র পূর্ণ স্বরূপ ও পরকালের অস্তিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-বিষয়ক সত্যে বিশ্বাস

করিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাদের মার্জ্জিত জ্ঞানের সহায়তা আবশ্যক করে না ; তেমনি তাহারা বিদ্যা বা জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত সহজে ধর্ম্মনীতিতে বিশ্বাস করিয়া থাকে। ধর্ম্মনীতি যে সহজ-জ্ঞান-সিদ্ধ তাহার একটি প্রমাণ এই যে তাহা মনুষ্যের জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে আবদ্ধ নহে; উহা বিদ্যা-বুদ্ধি-নিরপেক্ষ ও ব্যাপক। এমন কি ইহাও দেখা গিয়াছে, যে অনেক কাণ্ডজ্ঞানশূন্য মূর্খ, অনেক জ্ঞানী ও বিদ্বান অপেক্ষা সমধিক দৃঢ়তা, তৎপরতা ও আগ্রহের সহিত ধর্ম্মনীতির অনুসরণ করিয়া থাকে। আফ্রিকার অন্তঃপাতী উকুনি নামক প্রদেশে এক বর্ব্বর জাতি বাস করে। ইহাদের ব্যবহার পরীক্ষা কর তাহাতে সভ্যতার সামান্য উপকরণও পাইবে না। ইহারা ফলমূল ও পশুমাংসে দিনপাত করিয়া থাকে। এই জাতি চৌর্য্যবৃত্তি ও ব্যভিচার প্রভৃতি কার্য্য অত্যন্ত দোষাবহ জ্ঞান করে এবং ঐ সকল দোষে লিপ্ত ব্যক্তিদিগকে কঠিন ও গুরুতর দণ্ড বিধান করিয়া থাকে। সুবিখ্যাত পরিব্রাজক কাপ্তেন গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বলেন যে, তিনি যখন উকুনি প্রদেশে ভ্রমণ করেন তখন তথাকার এক গ্রামের এক ব্যক্তি ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। গ্রাণ্ট স্বচক্ষে দেখিয়াছেন গ্রামবাসীরা ঐ দোষী ব্যক্তিকে বন্ধন পূর্ব্বক বেত্রাঘাত করিতে করিতে তাহার পৃষ্ঠের চর্ম্ম উৎপাটন করিয়া ফেলে*। তৎ প্রদেশে ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত ব্যক্তির কখন কখন প্রাণদণ্ডও হইয়া থাকে। ঐ স্থানে নরহত্যায় প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। আমরা যে সকল কার্য্য ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ ও পাপ জ্ঞান করি, আফ্রিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী কারাগু নামক প্রদেশ নিবাসী অসভ্য জাতি প্রায় সেই সমস্ত কার্য্য ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ ও পাপ জ্ঞান করিয়া থাকে। এই জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত হইলে তাহার কর্ণদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলা হয়, এবং যদি কোন ক্রীতদাস ঐ দোষে লিপ্ত হয় তাহার অপেক্ষাকৃত গুরুতর দণ্ড হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি নরহত্যা করে তাহার সমস্ত বিষয় বিভব হত ব্যক্তির স্ত্রীপুত্রকে প্রদান করা হয়, এবং তাহার চক্ষু বিদ্ধ করিয়া তাহাকে এক উচ্চ শৈলশিখর হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। কাপ্তেন গ্রাণ্ট বলেন যে কারাগুনিবাসীরা হত্যা ও ব্যভিচার-দোষকে অতিশয় ঘৃণা করে এবং ঐ সমস্ত দোষে লিপ্ত ব্যক্তিকে উল্লিখিত প্রকার দণ্ড প্রদান করিয়া থাকে তজ্জন্য ঐ প্রদেশে জনসমাজ এক প্রকার সুশাসিত, এমন কি, ক্রীত দাস ব্যতীত অন্যান্য লোকের মধ্যে ঐ দুইটি দোষ একান্ত বিরল। গ্রাণ্ট সাহেব আরও বলেন যে, ইংলণ্ডে ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ দোষ সকল সংশোধনার্থ যে সকল দণ্ডের ব্যবস্থা আছে তদপেক্ষা কারাগু প্রদেশে হত্যা প্রভৃতি অপরাধের দণ্ড অতিকঠোর নহে তথাপি ইহা অতি বিস্ময়ের বিষয় যে সুসভ্য ইংলণ্ডবাসীদিগের মধ্যে ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ দোষ যেমন অধিকতর দেখা যায় বর্ব্বর কারাগুবাসীদিগের মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অংশে কম*। কারাগুবাসীদিগের মধ্যে কেহ চৌর্য্য-দোষে লিপ্ত হইলে চারিটী ছিদ্রযুক্ত একখণ্ড কাষ্ঠে তাহার হস্তপদাদি প্রবেশ করাইয়া অপরাধের গৌরব ও লাঘব অনুসারে তাহাকে দশ মাস পর্য্যন্তও রাখা হয়। গ্রাণ্ট সাহেব বলেন একদা একজন কারাগুবাসী রাত্রিযোগে এক দল বণিকের বাণিজ্য দ্রব্য অপহরণ করে। তদ্দেশের অধিপতি ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া আ-

---

* A Walk Across Africa By Captain J. P. Grant P. 107.

* A Walk Across Africa P.182.

নিয়া চিরদাসত্ব রূপ দণ্ড প্রদান করেন এবং বণিকদিগের যে সকল দ্রব্য অপহৃত হইয়াছিল তাহার পূরণার্থ তিনি স্বীয় কোষাগার হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করেন। কারাগুবাসীদিগের মধ্যে কেহ বিনাকারণে কাহাকে প্রহার করিলে দোষী ব্যক্তিকে দশটি ছাগ দণ্ড দিতে হয়। কেহ অপর কোন লোককে শরাঘাত করিলে বিচারে তাহার সম্পত্তি আক্রমণ করা হয় এবং ঐ সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ রাজার ও অপরার্দ্ধ আহত ব্যক্তির প্রাপ্য হইয়া থাকে। আফ্রিকায় উগান্দা, কারি, ও উয়াকুঙ্গু নামক তিনটি প্রদেশ আছে। তথাকার নিয়ম অতি সুন্দর। যাহাতে স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা হয় তদ্বিষয়ে সাধারণের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা আছে। এমন কি তৎপ্রদেশে সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা স্ত্রীলোকদিগের একটি সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তথায় ব্যভিচারের দণ্ড অতি গুরুতর। কাপ্তেন গ্রাণ্ট কোন এক ব্যভিচার-দোষ-লিপ্ত ব্যক্তির কর্ণদ্বয় ও হস্তের অঙ্গুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া দিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন ঐ সকল প্রদেশে কর্ণহীন মনুষ্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়; উহারা একদা ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত ছিল। আফ্রিকায় করুমা নামক একটি প্রদেশ আছে। তথায় যে অসভ্য জাতি বাস করে তাহাদিগের মধ্যে সতীত্বের বিশেষ আদর ও স্ত্রীজাতির প্রতি বিশেষ সম্মান দৃষ্ট হয়। কোন ব্যক্তি স্ত্রীলোকের অবমাননা করিলে কিম্বা স্ত্রীলোকের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিলে অধিকাংশ লোক ঐ স্ত্রীলোকের পক্ষ অবলম্বন করে এবং ঐ দুরাচার পামরের যথোচিত দণ্ড বিধান করিয়া থাকে। কাপ্তেন গ্রাণ্ট স্বয়ং এইরূপ একটি ঘটনা দেখিয়াছিলেন। আফ্রিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী বারি নামক প্রদেশনিবাসী বর্ব্বরেরা ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ কার্য্যে আন্তরিক ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে হত্যা, চৌর্য্যবৃত্তি, পরদারগ্রহণ প্রভৃতি দোষের উপযুক্ত দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে। জাঞ্জিবার প্রদেশে ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ দোষে কঠিন ও নিষ্ঠুর দণ্ডের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। বিশ্বস্ত সত্যপরায়ণ পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে সুস্পষ্ট অবগত হওয়া যায় যে কেবল আফ্রিকাখণ্ডে নহে, পৃথিবীস্থ অন্যান্য নানাস্থানের অসভ্য ও বর্ব্বর জাতিদিগেরও ধর্ম্মনীতির পরিস্কার ও সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে।

অনেকে কহেন যে জনসমাজের উপকার ও অপকার বিবেচনায় ধর্ম্মনীতি স্থির হইয়া থাকে। এ কথা নিতান্ত ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। ধর্ম্মনীতি যদি জনসমাজের উপকার ও অপকার ধরিয়া নির্ণীত হয় তাহা হইলে যে সমস্ত অসভ্যজাতি প্রকৃতির সদ্যোজাত শিশু, যাহাদের চিন্তাশক্তির কিছুমাত্র উন্মেষ হয় নাই, তাহাদের মধ্যে সমাজের উপকারিতা ও অপকারিতা-বোধ কি প্রকারে হইবে। আমরা বলি এই সত্যটি সহজ-জ্ঞান-লব্ধ এবং ইহা এই জন্যই বিশ্বজনীন।

ধ্যান ধারণা।

মাতৃ-ভক্ত সন্তান, যত মাতার অকৃত্রিম স্নেহ-প্রেমের বিষয় আলোচনা করেন, ততই যেমন সেই মাতার প্রতি তাঁহার চিত্ত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতিভরে অধিকতর রূপে অনুরক্ত হয়, কুল-পাবন সৎপুত্র যত পিতার অকপট প্রীতির বিষয় চিন্তা করেন, ততই যেমন তাঁহার পিতার প্রতি অনুরাগ বদ্ধ-মূল হয়, অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ, যত তাঁহার হৃদয়-বন্ধুর গুণ-গ্রাম সমালোচনা করেন, ততই যেমন সেই বন্ধুর প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রেমপ্রবাহ প্রবলতররূপে প্রবাহিত হয়, তেমনই

সেই পিতার পিতা, মাতার মাতা, চিরকালের সুহৃদ্-বন্ধু সখা পরমেশ্বরের জ্ঞান প্রীতি, স্নেহ-করুণা, ও মহিমার বিষয় যত চিন্তা করা যায়, তাঁহার বরণীয় জ্ঞান-শক্তি যত ধ্যান করা যায়, ততই তাঁহার প্রতি আত্মা অনুরক্ত হয়, ততই শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি তাঁহার প্রতি অধিকতর রূপে ধাবিত হইয়া তাঁহার সহিত যোগ-সম্মিলনের গাঢ়তা হইতে থাকে। সেই জন্য ধ্যানপরায়ণ হওয়া সাধক মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

পিতাপুত্রের মধ্যে স্বাভাবিক অকাট্য সম্বন্ধ থাকিলেও পুত্র যদি বাল্যাবস্থা হইতে দূর-দেশবাসী হন, পিতামাতার নিত্য-স্নেহে প্রতিপালিত হইতে না পারেন, প্রতি দিন তাঁহারদের অকপট প্রেমের অভিনয় প্রত্যক্ষ দেখিতে না পান, তাহা হইলে যেমন পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি অধিকাধিক রূপে স্ফূর্ত্তি পায় না; তেমনই ব্রহ্ম-পিপাসু আত্মা যদি ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা-পরায়ণ না হন, তাহা হইলে দিন দিন ঈশ্বরের নবতর কল্যাণতর জ্ঞান-প্রেম-মঙ্গল ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত না হওয়াতে ক্রমে তাহার অনুরাগ মন্দীভূত হইতে থাকে, ক্রমে তাহার আধ্যাত্মিক-যোগবন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। উন্নতিশীল আত্মা কোনরূপেই এক ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। একবিধ অন্ন পানে বর্দ্ধন-উন্মুখ আত্মার জ্ঞান-ক্ষুধা প্রেম-তৃষ্ণা কদাচ নিবারণ হয় না। সদ্য-ভূমিষ্ঠ শিশুর অবস্থা-ভেদে কাল-ভেদে কত প্রকার অন্নপানের ব্যবস্থা করিতে হয়, তবে সে কালক্রমে দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া যৌবন-শ্রী ধারণ করে। তাহাকে যদি কেবল মাতৃ-দুগ্ধে আমৃত্যু পালন করা যায়, তাহা হইলে তাহার শরীর অচির-কাল মধ্যেই জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। তেমনই আত্মা যদি কেবল ঈশ্বরের একরূপ জ্ঞান প্রেম প্রতীতি করিয়াই নিরস্ত থাকে, আর যদি স্বীয় জ্ঞানের উন্নতি,—প্রেমের প্রশস্ততা, মঙ্গলভাবের আকার আয়তন বৃদ্ধি করিতে না পারে; তাহা হইলে সে আপনার অন্ধতা অজ্ঞতা বশত ঈশ্বরের এক প্রকার পরিমিত ভাব দেখিয়া আর তৃপ্ত হয় না। ক্রমে তাঁহার প্রতি তাহার আস্থা অনুরাগ মন্দীভূত হইতে থাকে। তাহার কৌতূহল চরিতার্থ হইলে সে একমাস না হয়, একবৎসর; না হয় দশবৎসর পরেও হয় তো তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সংসার-গতিকে প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান সময়ের ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে ঈদৃশ শোচনীয় ঘটনা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমে যৌবন-সুলভ উৎসাহ অনুরাগে কত শত ব্যক্তিকে আগ্রহের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায়—ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, যত দিন না কৌতূহল চরিতার্থ হয় ততদিন কেমন নিয়মিত রূপে উপাসনাক্ষেত্রে উপস্থিত হন। আচার্য্য উপাচার্য্যের যত্ন চেষ্টায় আদেশ উপদেশে তাঁহারদের যতদূর উন্নতি হইবার তত দূর হইলেই তাঁহারদের উৎসাহ-অনল ক্রমে নির্ব্বাণ-উন্মুখ হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহারা আত্ম-চেষ্টা-বিহীন হইয়া গভীরতর বিষয়ে চিত্ত-সন্নিবেশ করিতে পারেন না, আত্মজ্ঞান-শূন্য হইয়া কেবল শব্দ সংগীতে ব্রহ্ম-লাভের চেষ্টা করেন, সুতরাং তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া ভগ্নহৃদয়ে উপাসনা-ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান-উদ্দীপক ব্রহ্মপ্রতিপাদক শব্দগুলি পুরাতন হইলে আর তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদন করিতে পারে না। তাঁহারা নূতন কথা শুনিবার জন্য কিছুকাল ইতস্তত ধাবিত হন, নূতন প্রণালী সংস্থাপনের জন্য বিব্রত হইয়া ভ্রাম্যমান হইতে থাকেন। "পুরাণ" ঈশ্বরের প্রতি আর দৃষ্টি থাকে না। কালক্রমে সেই নূতন বাক্য,

নূতন পদ্ধতি নূতন বক্তা পুরাতন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারদের অনন্তকাল-প্রতিপাল্য মহাব্রত প্রায়ই অকালে উদ্যাপিত হইতে দেখা যায়।

যিনি প্রকৃত-ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া উপসনা-ক্ষেত্রে গমন করেন.তাঁহাকে আর শূন্যহস্তে প্রত্যাগমন করিতে হয় না। যিনি প্রকৃত ব্রহ্মদর্শী তিনি সর্ব্বত্রই সকল আবরণ আচ্ছাদন ভেদ করিয়া স্বীয় ইষ্ট দেবতাকে দর্শন করেন। যিনি আত্ম-দর্শী, তিনি জ্ঞানপ্রসাদে শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া আত্ম-রূপ নিভৃত নিলয়ে সুরম্য নিকেতনে সেই আত্মার অন্তরাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হয়েন। সেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু সাধকের নিকটে ঈশ্বরের সত্তাতে সকলই নূতন। তাঁহার নবতর কল্যাণতর উৎসাহ—অনুরাগ-প্রভাবে সকলই তাঁহার চক্ষে নূতন ভাবেই প্রতীয়মান হয়। শব্দ সংগীত প্রভৃতি উপলক্ষ্য লইয়া তো তিনি ব্যস্ত বিব্রত নহেন, তিনি পরম লক্ষ্য পরমেশ্বরের জন্যই ব্যাকুল। কোন মনুষ্য ত তাঁহার আদর্শ নহে যে, তাহার দোষাদোষে তিনি মুগ্ধ বা উৎফুল্ল হইবেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মই" তাঁহার আদর্শ। তাঁহার উন্নততম আদর্শকে কেহই কলঙ্কিত করিতে পারে না। তাঁহার উপরে কালের অধিকার নাই, ঘটনারও আধিপত্য নাই। যিনি "সন সাধুনা কর্ম্মনা ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কনীয়ান্„ তিনিই সেই সাধকের আশ্রয় ও অবলম্বন। তিনিই তাঁহার নেতা বিধাতা মুক্তিদাতা সকলই। তাঁহাকে লাভ করাই সেই উপাসকের ইচ্ছা ও আকিঞ্চন। তিনি তো উদাসীন পথিকের ন্যায় ভ্রমণ করেন না, যে সকলই তাঁহার নিকটে অর্থশূন্য শোভাশূন্য তাৎপর্য্যবিহীন হইবে। তিনি প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু সত্যসন্ধ ব্রহ্মপিপাসু হইয়া সর্ব্বত্র গমন করেন, সুতরাং সকল পদার্থ সকল বস্তু সকল বাক্যই তাঁহার সন্নিধানে নূতন তত্ত্ব নূতন ভাব নবতর সত্য প্রকাশ করে। কবির চক্ষে যেমন কঠোর পর্ব্বত,ভীষণ সমুদ্র,নিবিড় অরণ্য,জ্বলন্ত সূর্য্য, কলঙ্কিত চন্দ্র প্রভৃতি মনোহর-ভাব-পূর্ণ কোমল ভাবে প্রকাশ পায়, তেমনই তত্ত্বরসার্দ্রচিত্ত সাধুর নিকটে সকলই সুধাময় অমৃতময় জ্যোৎস্নাময়। তাঁহার প্রস্ফুটিত জ্ঞানচক্ষুর সমক্ষে কিছুই কঠোর, কোন বস্তুই নীরস নহে—সকলই ব্রহ্মজ্ঞানামৃতরসে রসাল, সকলই প্রেমার্দ্র, সকলই পরমার্থ তত্ত্বে পরিপূর্ণ। অন্যের যেখানে সহস্র শব্দে চিত্তউত্তেজিত হয় না, সহস্র অনুপ্রাস উপমায় শ্রবণ মন পরিতৃপ্ত হয় না, তিনি সেখানে শিশুমুখ-বিনির্গত ঈশ্বরের প্রথম নাম ওঁঙ্কার শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র রোমাঞ্চিত শরীরে স্তম্ভিত হৃদয়ে ঈশ্বরের পূর্ণভাব উপলব্ধি করেন। তিনি এই একটী মাত্র শব্দে যে গভীর ভাব প্রাপ্ত হন, তাহা তাঁহার আত্মাকে সমস্ত জীবন স্বচ্ছন্দে পোষণ করিয়া থাকে। তিনি ওঁঙ্কার অর্থ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরের নিত্য নূতন সত্য নূতন জ্ঞান নবতর মঙ্গল ভাবের পরিচয় পাইয়া—আত্মাকে তাঁহার সন্নিধানে উপনীত করিয়া ওঁকার শব্দ কেন যে "প্রণব" বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন। তাঁর আত্মা যে ওঁকার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের সত্তা সর্ব্বদাই উপলব্ধি করিতেছে, তাঁর মানস-রসনা যাহাঁর মাহাত্ম্য সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া অনুপম আনন্দ অনুভব করিতেছে, সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হইতে অহর্নিশি যে সেই ব্রহ্মপ্রতিপাদক অনাহত গভীর নিনাদ উত্থিত হইতেছে, তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি নাদ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করত কৃতার্থ হয়েন।

ধ্যান ধারণা পক্ষে যত শব্দ আড়ম্বর অল্প হয় ততই মঙ্গল, সেই পরম লক্ষ্য সা-

ধন বিষয়ে ব্রহ্মযোজিত পরিণত আত্মার পক্ষে উপলক্ষ্য-মাত্র৷ যত সংক্ষেপ হয় ততই শ্রেয়। যে অল্পমাত্র শব্দে পরব্রহ্মের সত্য জ্ঞান অমৃত ভাব গাঢ়তর রূপে নিহিত আছে, যাহাতে ঈশ্বরের সুমহান্ পূর্ণ ভাব বিশেষ রূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাই তাঁহার সন্নিধানে অধিকতর আদরণীয়। সেই জন্যাই যোগ-প্রধান পুণ্য-ক্ষেত্র আর্য্য-ভূমি মধ্যে গায়ত্রীর এত সম্মান সমাদর। সেই জন্যই ওঁঙ্কার শব্দ হিন্দুসমাজ মধ্যে এত আদরের ধন। সেই কারণেই আর্য্য ঋষিগণ প্রণব ব্যাহৃতি ও গায়ত্রীর অর্থ মাহাত্ম্য লইয়া রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সেই নিমিত্তই মনুসংহিতা ওঁঙ্কার ব্যাহৃতি এবং ত্রিপাদ গায়ত্রীকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য বোধের নিমিত্ত প্রতি দিন নিরলস হইয়া বর্ষত্রয় প্রণব-ব্যাহৃতি-যুক্ত ত্রিপাদ গায়ত্রী জপকেই ব্রহ্মলাভের অদ্বিতীয় সাধন বলিয়া বিধি দিয়াছেন। সেই নিমিত্তই ওঁঙ্কার অমূল্য ধন, গায়ত্রী ত্রিবেদসার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই জন্যাই যে কার্য্যের মন্ত্র নাই, গায়ত্রীই তাহার মহামন্ত্র। যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; ব্রহ্মচিন্তার অদ্বিতীয় উপায় স্বরূপ গায়ত্রী-জপই তাহার মহা প্রায়শ্চিত্ত। যে কর্ম্মহীন সাধন-বিহীন ব্যক্তির আর গতিমুক্তি লাভের উপায়ান্তর নাই, ওঁঙ্কার গায়ত্রীই তাহার অমৃত লাভের এক মাত্র সোপান বলিয়া বেদ বেদান্ত, পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থই এক বাক্যে বিধি দিতেছেন। "ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ" "সেই ওঁঙ্কার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর, এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান-তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও"।

শুদ্ধ উপনিষৎ কেন, সাধন-সৌকর্য্যার্থে পুরাণ-তন্ত্রও ব্রহ্মবীজ ওঁঙ্কার শব্দের আদর্শে বহুবিধ অর্থপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত শব্দ সংগঠন পূর্ব্বক দেব দেবীর ধ্যান ধারণা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা বীজমন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যেরূপে যে প্রকারে যত বীজই কেন গঠিত হউক না, ব্রহ্মবীজ, প্রথমনাম ওঁঙ্কারই তাহার এক মাত্র আদর্শ। বস্তুত প্রণব ব্যাহৃতি ও ত্রিপাদ গায়ত্রী মধ্যে সাধকের প্রয়োজনীয় যেরূপ অমৃত-সার নিহিত আছে, এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। গায়ত্রী ধ্যান ধারণার যে প্রকার উপযোগী, এমন দ্বিতীয় মন্ত্র আর প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই জন্যই গায়ত্রী আর্য্যজাতির সর্ব্বস্ব ধন। সেই কারণেই শঙ্কর ব্যাস ও মহাত্মা রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকগণ গায়ত্রীর এত অনুরাগী হইয়াছিলেন। এক ওঁঙ্কার শব্দ কি সার-গর্ভ! কি সহজ উচ্চার্য্য! পরব্রহ্মের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তৃত্ব ভাব এক শব্দেই অভিব্যক্ত হইতেছে। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ পৃথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্গ। ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিই সমুদায় বিশ্বব্যাপক। "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং" গায়ত্রীর এই প্রথম পাদ। (জগৎ-প্রসবিতার সেই বরণীয়) "ভর্গোদেবস্য ধীমহি" দ্বিতীয় পাদ। (তাঁহার জ্ঞান শক্তি ধ্যান করি) "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" তৃতীয় পাদ। (যিনি আমারদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন)। ইহাতে ঈশ্বরের কেমন মহান্ ভাব ব্যক্ত হইতেছে। সেই পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার কেমন স্রষ্টা সৃষ্ট, আশ্রয় আশ্রিত, দাতা গৃহীতা, উপাসক ও উপাস্য ভাব বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আত্মার কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার প্রতি তাঁহার কেমন অকপট-পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ প্রদর্শিত হইতেছে। যিনি অসীম আকাশে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে,

জ্বলন্ত সূর্য্যে বর্ত্তমান; তিনি আমার আত্মার মধ্যে বিরাজমান। যিনি একাকী অনন্ত চরাচর শাসন করিতেছেন, যিনি বজ্রে বল, বায়ুতে শৈত্য, জলেতে তৃপ্তি, চন্দ্রে কান্তি, সূর্য্যে জ্যোতি বিধান করিতেছেন; তিনি আমার আত্মাতে থাকিয়া আত্মাতে ধর্ম্মবল ও শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন, কি মনোহর ভাব! কি উৎসাহকর বাক্য! ধ্যান ধারণার কি সহজতর উপলক্ষ্য। যোগের গাঢ়তা সম্পাদন জন্য সাধক ধ্যান-ধারণা-পরায়ণ হইবেন। কদাচ উপাসনাবিহীন হইবেন না। ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি মহিমা চিন্তনে নিযুক্ত থাকিলে ক্রমে আত্মাতে নূতন সত্য —তাঁহার নবতর কল্যাণতর স্নেহকরুণা প্রকাশ পাইতে থাকে। ক্রমে ধৃতি সমাধি-শক্তি বর্দ্ধিত হইলে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি আরো অধিকতর রূপে তাঁহার প্রতি উদ্দীপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ তাঁহাতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অটল নির্ভরের ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে।

তিনি আমাতে বর্ত্তমান, আমি তাঁহাতে সংস্থিত রহিয়াছি, ইহা অহর্নিশি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা তখন আত্মার সহজ ভাব হইয়া উঠে। সুতরাং পাপচিন্তা বিষয়-লালসা আপনা হইতেই দূরীভূত হয়। সকল আবরণ আচ্ছাদন তিরোহিত হইয়া যায়। তখন জ্ঞান-চক্ষু কেবল তাঁহার প্রতিই উন্মীলিত থাকিয়া তাঁহার অনুপম জ্যোতি অতুলন মহিমাই নিরীক্ষণ করিতে থাকে. প্রেম-প্রবাহ কেবল তাঁহারই প্রতি ধাবিত হয়, মানস-রসনা নিরবচ্ছিন্ন তাঁহার অমৃত রস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। তাঁহা হইতে বিচ্যুতি ও বিক্ষেপ-আশঙ্কা তিরোহিত হইয়া যায়। সেই জ্বলন্ত-জ্যোতি—সেই উজ্জ্বল প্রেম হৃদয়ে জাগ্রৎ থাকিলে বিষয়-প্রলোভন, ইন্দ্রিয়-সুখের আকর্ষণ আর চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না প্রত্যুত সংসার-বন্ধন শিথিল হইয়া আত্মাকে সম্পূর্ণ মুক্তিইচ্ছু করিয়া তোলে।

মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ইউরোপের উপকার সাধন।

৪২২ সংখ্যক পত্রিকার ১১৯ পৃষ্ঠার পর।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরবদিগের সামান্য গ্রানাডা রাজ্য একটি পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যবৎ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়া ছিল। জেনোয়ানিবাসীরা গ্রানাডার রাজধানী দর্শন করিয়া তাহার একটী বিবরণ লিখিয়া যায়। উহারা বলে যে তাহারা যত দুর্গ-বেষ্টিত নগর দেখিয়াছে তন্মধ্যে গ্রানাডা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঐ নগরের সুদৃঢ় প্রাচীর এক সহস্র গুম্বজে রক্ষিত। তথায় যে দুইটি দুর্গ ছিল, তন্মধ্যে যেটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তাহাতে চল্লিশ সহস্র সৈন্যের স্থানসঙ্কুলন হইত। ধনীগণের বাসভবন নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে খচিত ছিল। রাজপথ সকল প্রস্তরনির্ম্মিত ও আলোকমালায় সুশোভিত ছিল। উন্নতির এই দুইটি চিহ্ন ইহার বহুদিন পরে দক্ষিণ ইউরোপে পরিলক্ষিত হয়। দেশ দেশান্তর হইতে বহুসংখ্যক লোক গ্রানাডার বাজারে আসিয়া নানাবিধ দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিত। তত্রত্য অধিবাসীদিগের মধ্যে বিশ্বাস এমনি প্রবল ছিল যে, তাহারা মুখে যাহা স্বীকার করিত, তাহা এখনকার সুসভ্য রাজ্যের লিখিত অঙ্গীকার-পত্র অপেক্ষা অটল। গ্রানাডার প্রত্যেক যুবরাজের প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় ছিল। ইহাঁরা বহু সংখ্যক বিদ্যালয় চিকিৎসালয় জলপ্রণালী, ও পান্থনিবাস প্রস্তুত করিয়া দেন। যুদ্ধের উপযোগি বস্তু সকল তথায় প্রচুর রূপে সঞ্চিত ছিল। শান্তিকালেই

শতসহস্র সৈন্য বহু বেতনে নিযুক্ত থাকিত। এখন সমস্ত স্পেনে যতগুলি দুর্গ আছে তখন কেবল এক গ্রানাডা রাজ্যে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক দুর্গ ছিল। মালাগা ও আলমিরা আরবদিগের রাজ্যান্তর্গত ছিল। এই দুইটি প্রদেশ প্রায় গ্রানাডার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী ছিল।

আমরা উপরে মধ্যকালে আরবদিগের অবস্থার বিষয় যাহা উল্লেখ করিলাম তাহা এক প্রকার অসম্পূর্ণ, কিন্তু তথাচ উহা দ্বারা তৎকালে আরবেরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা প্রায় সকল বিষয়ে যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল তাহা প্রতিপন্ন হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে আরবদিগের সহিত ইউরোপীয় জাতিগণের কতদূর সংশ্রব ছিল। সিসিলি রাজ্য দুই শত এবং স্পেন দেশের অধিকাংশ স্থান সাত শত আশি বৎসর আরবদিগের শাসনাধীন ছিল। ইটালীর অন্তঃপাতী আমাল্‌ফি নামক নগরের সহিত স্পেনদেশীয় আরবদিগের বাণিজ্য চলিত। বিখ্যাত ইংরাজ পুরাবৃত্তকার হ্যালাম বলেন যে দ্বাদশ শতাব্দীর একজন গ্রন্থকর্ত্তা ইটালীর অন্তঃপাতী পিসা নগরে আরব বণিকদিগের প্রাদুর্ভাবের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। হ্যালাম আর এক স্থলে লিখিয়াছেন যে বিনিসের ন্যায় ইউরোপের অন্য কোন খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রধান রাজ্য মুসলমানদিগের সহিত এত গাঢ় যোগ সংস্থাপন করে নাই। বিনিস নগরীর বণিকেরা আরবদিগের অধিকারভুক্ত একার ও আলেকজেন্দ্রিয়া নগরে বাণিজ্যার্থে গমনাগমন করিত। কিন্তু এই সংশ্রব নিবন্ধন বিনিসনগরবাসীরা আরবদিগকে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বিদ্বেষ করিত না। জেনোয়াবাসীদিগের গ্রানাডা রাজ্যে কতকগুলি বাণিজ্যাগার ছিল, এবং তাহারা এই সূত্রে তথাকার কালিফের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া ছিল। ইটালীর ভূতপূর্ব্ব রাজধানী ফ্লরেন্স নগরীর বণিকেরা গ্রানাডা হইতে প্রচুর পরিমাণে রেসম আনয়ন করিয়া স্বদেশে বিক্রয় করিত। ফ্লরেন্স ও ইটালীর অন্যান্য নগরবাসীরা স্পেনদেশীয় আরবদিগের নিকট শিল্প কার্য্য শিক্ষা করে। তত্রত্য আরবজাতির সহিত তদ্দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের কি যুদ্ধ কি শান্তি সকল অবস্থাতেই বিশেষ প্রীতি ছিল। ফ্রান্সের অন্তঃপাতী প্রভিন্স নামক প্রদেশবাসীদিগের সহিত আরবজাতির সামান্য সদ্ভাব ছিল না। ভিন্ন জাতি ভিন্ন ধর্ম্ম, এবং পরস্পরের যুদ্ধ বিগ্রহ এই সমস্ত প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব, ইটালী স্পেন ও প্রভিন্সনিবাসী খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপীয়দিগের সহিত এসিয়া এফ্রিকা এবং আন্দালুসবাসী আরবদিগের ততদূর সদ্ভাব ছিল। যদিও ইটালী প্রভৃতি দেশবাসীরা আরবদিগের জনতাপূর্ণ নগর, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, উর্ব্বর ভূমি ও উৎকৃষ্ট শিল্প এই সমস্ত বাহ্য উন্নতিকে ভয় ও ঈর্ষার সহিত দেখিত, তথাপি উহারা তাহাদিগের নিকট ঐ সকল বিষয়ে সম্যক শিক্ষা লাভ করে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মেনী হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র স্পেনে আরবদিগের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ উপস্থিত হইত। তথায় সুবিদ্বান আরব অধ্যাপকেরা আরিষ্টটলের ন্যায়শাস্ত্র, ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং আর্কমিডিসের বৈজ্ঞানিক উপদেশ ব্যাখ্যা করিতেন। ইউরোপের নানা স্থানের সামুদ্রিক ব্যবসায়ীগণ স্পেনে আসিয়া তথায় পশুচর্ম্ম উর্ণা ও বসার বিনিময়ে ভারতবর্ষীয় গন্ধ দ্রব্য ও মণিমুক্তা, ডামাস্কসের অস্ত্রফলক এবং গ্রানাডার রেশম লইয়া যাইত। শান্তির সময়ে অনেক নাইট স্পেনদেশীয় কালিফদিগের রাজসভায় বহু সমাদরে গৃহীত হইতেন এবং তথায় নানা প্রকার যুদ্ধবিদ্যায়

আপনাদিগের দক্ষতা ও সাহস প্রদর্শন করিতেন।

সকল ইতিহাসলেখকেরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপে অজ্ঞানান্ধকারের কাল শেষ হয় এবং তাহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান-সূর্য্যের জ্যোতি তথায় বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। দশম শতাব্দীর পরবর্ত্তী চার শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে ধীরে ধীরে ধনের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, নগর সকল সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল, এবং শিল্প কার্য্য ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইল। ইটালী, প্রভিন্স ও স্পেন প্রভৃতি যে সমস্ত দেশের সহিত আরবদিগের বিশেষ যোগ ছিল, এই সমস্ত পরিবর্ত্তন তথায় সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হয়। ইহা দ্বারা ইউরোপে যে অনেক বিষয়ে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইল তাহাতে আরবদিগের ক্ষমতাই স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। ইহাদের প্রচারিত দর্শনশাস্ত্র আন্দালুস হইতে সিসিলি পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এই দর্শন অনেক খ্রীষ্টিয়ানকে স্বধর্ম্মে বিদ্রোহী করিয়াছিল। শেষ এই দর্শন সাধারণ জন দ্বারা এতদূর আদৃত হইতে লাগিল, যে খ্রীষ্টধর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাড়না ও নিগ্রহ দ্বারা ইহার প্রচার রোধ করিতে চেষ্টিত হইলেন। আরিষ্টটলের দর্শন শাস্ত্র খ্রীষ্টধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া ইউরোপের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির মনে স্থানপ্রাপ্ত হইল; এবং পরিশেষে যে খ্রীষ্টীয়ানেরা ইহার প্রচারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বয়ংই ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। আরবদিগের দ্বারা প্রচারিত দর্শন ক্রমশঃ ইউরোপের সর্ব্বস্থানে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইল; আরবী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষা হইতে গণিত শাস্ত্রের কতকগুলি গ্রন্থ ইউরোপীয় অনেক ভাষায় অনুবাদিত হইল। বর্ত্তমান ইউরোপে সর্ব্ব প্রথমে সেলার্নো নগরে এবিসেনার এক জন ইটালীয় ছাত্র একটি চিকিৎসালয় সংস্থাপন করেন। ঐ ছাত্র প্রাচ্যদেশে ৩৯ বৎসর চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। স্পেনের ইতিহাস লেখক প্রেসকট বলেন যে স্পেনের কাষ্টাইল ও ফ্রান্সের প্রভিন্স প্রদেশের সাহিত্য গভীর ও স্থায়িতর রূপে আরবী আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। গথিক নামক স্থাপত্য প্রণালীর উদ্ভব-স্থান বিষয়ে যে কএকটি মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে বোধ হয় যে মত পূর্ব্ব দেশকে ইহার উদ্ভব ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত। সূচীর ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র খিলান এই গথিক প্রণালীর একটি প্রধান লক্ষণ। নবম শতাব্দীতে কেরো নগরে যে একটি মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে ঐ প্রকার একটি খিলান দৃষ্ট হয়। গৃহনির্ম্মাণে রঞ্জিত কাচ ব্যবহার, গবাক্ষোপরি সূক্ষ্ম কারকার্য্য, জ্যামিতি-বিবৃত আকৃতি সকলের ন্যায় শ্রমসাধ্য নানা রূপ চিত্র গথিক ও আরবীয় স্থাপত্যে দৃষ্ট হয়। ডাক্তার ড্রেপার স্বপ্রণীত "ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে সিভালরি* প্রথা সর্ব্ব প্রথমে স্পেন দেশীয় আরবদিগের দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়া ইউরোপে প্রচলিত হয়, একথা কতদূর যথার্থ আমরা বলিতে পরি না কিন্তু এই প্রথা স্পেনদেশীয় আরবদিগের মধ্যে অন্যান্য সকল দেশ অপেক্ষা যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

---

* মহত্ব ও বীরত্ব সূচক কার্য্য করত দেশ পর্য্যটন স্ত্রীলোকের প্রতি গভীর সম্মান ও অনুরাগভাব প্রভৃতি গুণ জন্য অতীব গৌরবাস্পদ নাইট উপাধি প্রদান শিবালরি প্রথার প্রধান লক্ষণ ছিল।

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত।)

৪২২ সংখ্যক পত্রিকার ১২২০ পৃষ্ঠার পর।

(২২১)

ঈশ্বরকে কখন বিপদে পড়িতে হয় নাই, পড়িতে হইবেও না।

এরিষ্টাইডিস নামক সফিষ্ট।

(১২২)

যেমন পুত্র পিতা অপেক্ষা প্রধান নহে কিম্বা শিল্প-কার্য্য শিল্পকর অপেক্ষা প্রধান নহে তেমনি কোন বস্তু ঈশ্বর অপেক্ষা প্রধান নহে। তিনি আদি ও প্রধান পুরুষ এবং সকল ভূতের রাজা। তিনি আপনি আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। কেহ বলিতে পারে না কখন তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন। কারণ তিনি প্রথম অবধিই আছেন এবং চিরকালই আপনার পিতা আপনি থাকিবেন। তিনি এত মহৎ যে অন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারেন না।

ঐ

(১২৩)

ঈশ্বর সকল বস্তুর আদি এবং সকল বস্তু তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি অকাল পুরুষ, কাল জগতের সঙ্গে সৃষ্ট হইয়াছে।

ঐ

(১২৪)

সকল বস্তু তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ আছে এবং তাঁহার প্রতি নির্ভর করিতেছে। তিনিই প্রথমে প্রীতি ও নিয়ম এই দুই প্রবল বস্তু-বিধারক পদার্থ সৃষ্টি করিলেন যে সকল বস্তু তদ্দারা দৃঢ় সম্বন্ধে বিধৃত থাকিবে।

ঐ

(১২৫)

এই সমস্ত জগৎ তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার দিকে সর্ব্বদা চাহিয়া রহিয়াছে, দেবতারা পর্য্যন্ত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ সকল বস্তু তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভর করিতেছে।

প্লোটাইনস

(১২৬)

যদ্যপি চিত্রকর, ভাস্কর, কবি এবং দার্শনিক এই রূপ বিভিন্ন বৃত্ত্যাবলম্বী লোকের একটী সভা আহ্বান করা যায় এবং তাহাদিগকে ঈশ্বর বিষয়ে তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় বলিতে অনুরোধ করা যায় তাহা হইলে তুমি কি মনে কর যে চিত্রকর এক রূপ বলিবে, ভাস্কর অন্যরূপ বলিবে, কবি অন্য রূপ বলিবে, দার্শনিক অন্য রূপ বলিবে, এমন কি, শক কিম্বা গ্রীক কিম্বা পৃথিবীর উত্তর সীমান্তবাসী অন্যরূপ বলিবে? অন্যান্য বিষয়ে মনুষ্য পরস্পর বিরোধী বাক্য বলে. কাহার সহিত কাহারও ঐক্য নাই, কিন্তু এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সকলের রাজা ও পিতা, এই বিষয়ে দেখিবে সমস্ত পৃথিবীর এক মত। কি গ্রীক, কি বর্ব্বর, কি মহাদ্বীপবাসী, কি সমুদ্র উপকূলবাসী, কি জ্ঞানী কি অজ্ঞ, সকলেই এই কথা বলিবে।

মেক্সিমস্ টাইরিয়স্।

(১২৭)

দেব দেবী আছে এবং জগতের উপর সেই সকল দেবতাদিগের নিয়ন্তৃত্ব আছে ইহা সকল সম্প্রদায়ে* বিশ্বাস করে। কিন্তু তথাপি তাহারা এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকারণকে স্বীকার করে এবং সকল স্থানের মনুষ্য বিপদ সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দেবতা ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করে ইহার কারণ এই যে বহুত্ব অপেক্ষা একত্ব তাহাদিগের নিকট আরও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

প্রোক্লস

(১২৮)

ঈশ্বর আরাধনার সময়ে আমরা তাঁহাকে

---

* লেখকের সময় পৃথিবীর এই ভাব ছিল।

এই প্রকারে প্রার্থনা করিয়া থাকি "প্রভু! আমাদিগের প্রতি করুণা কর।"

এপিকটিটস।

(১২৯)

যেমন সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, ভূমি, সমুদ্র, পৃথিবীর সকল স্থানের সাধারণ বস্তু কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে তেমনি এই সকল বস্তুর ব্যবস্থাকারী জ্ঞান স্বরূপ পদার্থ এবং সকল বস্তুর বিধানকর্ত্তা নিয়ন্তা পুরুষ এক, তিনি ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন দেশের পূজার নিয়মানুযায়ী পৃথিবীর সকল স্থানে পূজিত হইয়া থাকেন।

প্লুটার্ক।

(১৩০)

এই বৃহৎ শোভন অট্টালিকারূপ জগৎ উহার স্রষ্টা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে অথবা তাঁহার স্বরূপ হইতে বিভিন্নভাবে স্থিতি করিতেছে না; তিনি এখনও সতন্ত্র ভাবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহার উপর নিয়ন্তৃত্ব করিতেছেন।

ঐ।

(১৩১)

ঈশ্বর তিনি যাঁহার সম্বন্ধে আমরা মনুষ্য কখন নীরব নহি, যাঁহা দ্বারা সকল বস্তু পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তিনি সকল স্থানে আছেন ও সকল পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এবং তাঁহার করুণা আমরা সর্ব্বদা উপভোগ করিতেছি যেহেতু আমরা তাঁহার সন্তান।

এরেটস্।

(১৩২)

তিনি জগতের চমৎকার পদার্থ এবং মনুষ্যের পরমার্থ।

ঐ।

(১৩৩)

ঈশ্বর সত্যের অধিরাজ। ঈশ্বর শান্ত স্বরূপ ও আশুতোষ।

ডিমডোনামক গ্রন্থ প্রণেতা।

(১৩৪)

ঈশ্বর সকল বস্তুর আদি, অন্ত ও মধ্য ধারণ করিতেছেন।

প্লেটো।

(১৩৫)

ঈশ্বর সকল মনুষ্যের এবং সমস্ত জগতের রাখাল।

অর্ফিউস।

(১৩৬)

(ঈশ্বর স্ত্রীরূপে বর্ণিত)

সেই দেবীই ঈশ্বর, যিনি তোমাকে আমাকে এবং সকল মনুষ্যকে লালন করিতেছেন এবং যিনি স্বর্গ মর্ত্তাকে সখ্যভাবে মিলিত করিয়া একত্রে কার্য্য করাইতেছেন।

ইউরিপাইডিস্।

(১৩৭)

আমি অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিতেছি যে শরীর ও আত্মার পরস্পর বিচ্ছেদ অপেক্ষা তাহাদিগের সংযোগ কখন শ্রেয়স্কর নহে।

প্লেটো।

(১৩৮)

আমরা যে মনুষ্য, কেবল আমাদিগের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে এমত নহে কিন্তু আমাদিগের উপরে দেবতাদিগের সঙ্গে এবং নিম্নে পশুদিগের সঙ্গেও আমাদিগের সম্বন্ধ আছে। যেহেতু একমাত্র পুরুষ শরীরস্থ আত্মার ন্যায় সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এবং তাঁহার সকল অংশ এক সূত্রে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

সেক্‌শটস এম্পিরিকিসোদ্ধৃত
পিথাগোরীয় সম্প্রদায়ের মত।

(১৩৯)

পশুদিগের প্রাণ অথবা আত্মার কারণ কে? যে মহৎ পুরুষ সূর্য্য গ্রহ তারকাগণ বিশিষ্ট সমস্ত দ্যুলোককে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই তাহার কারণ।

এরিষ্টটেল।

ক্রমশঃ

EXTRACT.

INDIAN SYSTEM OE CASTE.

TO THE EDITOR OF THE "INDIAN MIRROR."

DEAR SIR,—With reference to the remarks which you made in your issue of Sunday last upon the paper of Babu Nobo Gopal Mitra on "Caste," lately read before the Social Science Association, and in which you recommend the absolute necessity of abolishing caste altogether, I deem it neccessary to make the following observations.

Caste must exist in one form or other in every country. A rich merchant of England will not dine with, or marry his daughter to, an artizan, however well-to-do, honest, virtuous and pious the latter may be. Even a rich goldsmith of England will not dine with a very poor one, though a member of his own trade, on terms of social equality which is however not the case in India. Here a rich goldsmith will gladly dine with his caste-men, however poor the latter may be. It is, therefore, evident that caste must exist in some shape or other in every country, if not in the form in which it exists in India, at least in the form of the *caste of wealth*, whose demands are no less rigorous and exacting than those of the Indian system of caste. The American ladies in Dickens' novel, who had been all along honoring Martin Chuzzlewit as a great man, uttered a shriek of horror when they heard that he had come as a deck-passenger on board, the ship in which he had sailed over from England to America. The influence of the caste of wealth is ably illustrated by the powerful pen of Dickens in this story. If caste must exist in a certain form in every country, what objection there could be to the Indian system of caste, which is founded on the feeling of respect and veneration for learning, piety and virtue? That the Indian system of caste is founded on such respect and veneration is evident from pious and learned Brahmins being more respected than those who betake themselves to worldly occupations. The learning taught or acquired by Brahmins in India, may not be of the same character as is cultivated in Europe. The present race of Brahmins may be more degraded than that of ancient times. Europeans may consider the piety of a Brahmin to be of a superstitious character, but they must still recognize as noble the *principle* on which the Indian system of caste is founded, that is, the principle of paying respect to piety and learning. Inordinate respect for wealth makes the mind mean and sordid, while such respect for piety and learning ennobles it. I admit that some evil consequences have resulted from the institution of caste in India, but still the foundation on which the superstructure is built must be considered to be nobler than that on which the caste system of Europe rests. No country, I repeat, can exist without distinctions of caste. If we abolish our present system of caste, it is sure to be succeeded by a worse one, that is, the caste of wealth, from the evils of which Europe and America are now suffering. Certainly the aristocracy of piety and learning is preferable to the aristocracy of wealth. We can improve the present system of caste, but should not abolish it altogether. As society improves, the Brahmins of India may be gradually expected to improve also as a class. If proper encouragement be held out to students of *toles*, they may be expected to combine vernacular learning with Sanskrit. Vernacular learning of the present day will give them an insight into the history, the science and the philosopy of Europe. As Theism makes progress in the country, learned Brahmins may be expected to make a full profession of Brahmoism, they being now half Brahmos, the name of Brahma being used in almost all the *mantras* repeated by them, especially the *Gayatri*. You must admit the great advantages of the existence in the country of a class of men solely devoted to the profession of religion and learning. If the existence of such a class be necessary, why not improve the indigenous one already existing? The superstitious reverence which is paid to Brahmins, is gradually disappearing with the progress of education and enlightenment. The reforms which I have mentioned above have already begun to manifest themselves, though in a faint degree, in that body, I know of some learned Bhattacharyas being good vernacular scholars and of others giving theistic *mantras* to their *sishyas*. For the reasons stated above, the necessity of a learned *caste* in the country to counteract the effects of the *caste* of wealth, which will undoubtedly arise in it with the influx of European civilization, must be admitted. The Brahmins, from their antecedents, pursuits and superior intelligence to the rest of the community of which more anon, are entitled to constitute, and already do constitute, that caste.

Proceeding on Darwin's Theory of Natural Selection, Galton, the learned author of the "Theory of Development," recommends the introduction of the custom of intelligent men marrying intelligent women with the view of preventing the occurence of dearth of talent in a country, which is now complained of by Englishmen as having already set in in theirs. In our country the custom already exists, men of the higher castes being the intelligent among the people, and invariably marrying into their own caste. We find men of the higher castes succeed in obtaining the university degrees of India, and those England-going Natives, who obtain success in the examinations in England, are also generally high caste men. High caste men are generally found to rise to the highest posts in the service of Government, through the natural buoyancy of their hereditary genius and talents. The most successful Pleaders of the High Court are all high-caste men. The greatest religious and social reformers of our country, as well as the most eminent English scholars, have been Brahmins. Chaitanya was a Brahmin, Rammohun Roy was a Brahmin, Debendra Nath Tagore is a Brahmin, Iswara Chunder Vidyasagar is a Brahmin, Ram Tanu Lahiri is a Brahmin, and Krishna Mohun Bannerji is a Brahmin. When we want to abolish caste altogether, we should consider the mischief that we might commit by abolishing a system that prevents the occurrence of dearth of talent in a country.

Caste might be used as a powerful instrument for the moral improvement of the country. A generation or two ago, adulterers and drunkards in a village were punished by social excommunication. This acted as a great moral deterrent. If the bonds of society were not relaxed under the influence of European education and civilization, the custom of punishing drunkards by social ex-communication would have still existed and prevented the baneful practice of drinking that is awfully increasing in the country. Let the members of a caste punish the immoral men of their caste with social ex-communication, and then you will see what salutary consequences flow from the preservation of the institution of caste. A European writer in the *Statesman*, in his description of Assam, published in that journal about a year ago, says:—"It is surprising what an influence caste has amongst those half-savage people. It is the greatest moral ruler without which the country would be a moral pest-house,it possesses an influence for good which one does not find in other lands under their vaunted civilization and religious culture."

The present system of caste certainly admits of modifications. For instance, the subcastes, that is, the castes within a caste,may be abolished with advantage, and the extremely rigorous rules about dining with people of other castes, may be also relaxed with benefit to society. We can also follow other professions than our hereditary ones, if necessity requires us to do so; but the system of caste should not be materially changed for the reasons stated above.

One of the evils, that are now afflicting our country, is that people do not think independently, but judge of things through an English medium. We should not permit European civilization to make us totally blind to the benefits of Native institution,and allow the tide of reformation that has set in in the country to wash away whatever there is of good in the venerable institutions of our forefathers. We should say to it:—"Thus far shalt thou come and no further."

Yours &c.,
Bose.

The 3rd September, 1878.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক শুক্রবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধমূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯৩৫। কলিগতাব্দ ৪৯৮০। ১ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

Registerd No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৪২৪ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৮০০ শক।
ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বর-প্রীতি।

যখন জগতে যেমন সুখ আছে, তেমনি দুঃখও আছে, আর সে দুঃখের পরিমাণ অল্প নহে, তখন ঈশ্বরকে আমরা কি প্রকারে প্রীতি করিতে পারি? সংশয়বাদীরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, ঈশ্বরবাদীরা তাহার এইরূপ প্রত্যুত্তর দেন যে আনুসঙ্গিক দুঃখ ঘটিলেও যখন প্রত্যেক সাধারণ নৈসর্গিক নিয়মের উদ্দেশ্য মঙ্গল, তখন ঈশ্বরকে অবশ্য মঙ্গলময় পুরুষ বলিতে হইবে এবং তজ্জন্য তাঁহাকে প্রীতি করিতে হইবে, কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতি এরূপ যুক্তির উপর নির্ভর করে না। যদি কেবল উপকারের জন্য ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে হয়, তবে যখন তিনি দুঃখ প্রদান করিতেছেন তখন তাঁহার কার্য্যের সাধারণ উদ্দেশ্য মঙ্গল হইলেও তিনি কিরূপে সম্পূর্ণ প্রীতির পাত্র হইতে পারেন? ঈশ্বর-প্রীতি তর্ক ও যৌক্তিক-প্রমাণ-জনিত নহে। উহা ঈশ্বরের সহিত আত্মার নিগূঢ়-সম্বন্ধ-জনিত। ঈশ্বরকে আমরা ভাল না বাসিয়া কখন থাকিতে পারি না। ভ্রমর যেমন পদ্মকে স্বভাবতঃ প্রীতি করে, বুলবুল যেমন স্বভাবতঃ গোলাবকে প্রীতি করে, পতঙ্গ যেমন স্বভাবতঃ দীপ্তাগ্নিকে প্রীতি করে, ঈশ্বরকে আমরা সেইরূপ স্বভাবতঃ প্রীতি করি। ঈশ্বর যদি আমাদিগকে অত্যন্ত দুঃখ প্রদান করেন এবং চিরকালই যদি সেইরূপ দুঃখ প্রদান করেন, তথাপি আমরা তাঁহাকে প্রীতি না করিয়া থাকিতে পারি না। কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত জীবিত জীবের প্রাণন ক্রিয়া কিরূপে সাধিত হয় তাহা অবধারণ করিবার জন্য তাঁহার কুকুরকে একবারে মারিয়া না ফেলিয়া তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্পাদন করিতেছিলেন। কিন্তু এমত উৎকট যাতনার সময়েও প্রভুভক্ত কুকুর তাহার প্রভুর হস্ত লেহন করিতেছিল। ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের প্রীতিও এই প্রকার। কিন্তু পরমেশ্বর উক্ত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের ন্যায় নির্দ্দয় নহেন। তিনি আমাদিগের মঙ্গলময় পরম পিতা ও সুহৃৎ। কোন ঈশ্বর-ভক্ত বলিয়াছেন "ঈশ্বর আমাকে বলিলেন তোমাকে কাটিয়া ফেলিব কিন্তু দেখিলাম এই কথা বলিবার সময়েও ভিতর ভিতর আমার প্রতি তাঁহার প্রেম দৃষ্টি আছে"। ঈশ্বরের কোন কোন

কার্য্য আপাতত অতিশয় নির্দয় বোধ হয়, কিন্তু যুক্তি নয়, আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে তাঁহার উদ্দেশ্য মঙ্গল। অবিচলিত চিত্তে সেই আপাত-প্রতীয়মান নির্দ্দয়তা সহ্য করিতে হইবে। যদি ঈশ্বরের বিশ্বজনীন মঙ্গল অভিপ্রায় সাধন জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে হয় তাহা হইলে তাহা করা কর্ত্তব্য। কেবল "করা কর্ত্তব্য" নহে। বস্তুতঃ ঈশ্বর-ভক্ত এইরূপ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার প্রিয়তম তাঁহাকে কষ্ট প্রদান করিলেও তিনি তাঁহাকে প্রীতি না করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। পতঙ্গ জানে যে দীপ্তাগ্নিতে পতিত হইলে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে তথাপি তাহাতে পতিত না হইয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বর-প্রীতির অনেক দাবিদার আছে কিন্তু দীপ্তাগ্নির প্রতি পতঙ্গের যেরূপ প্রেম, ঈশ্বরের প্রতি সেরূপ প্রেম কয়জন লোকের দৃষ্ট হয়?

ঈশ্বর-প্রীতি ধর্ম্মের প্রাণ।

ঈশ্বর-প্রীতি পরোপকারাদি সৎকার্য্যের প্রাণ-স্বরূপ। জগতের উপকার সাধনের মূলে যদি ঈশ্বর-প্রীতি না থাকে তাহা হইলে সেই উপকার-সাধন-ব্রত জীবনশূন্য হয়। যদি ঈশ্বর-প্রীতি দ্বারা কোন ব্যক্তি উত্তেজিত না হয়েন তবে তিনি আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া সহস্র কষ্ট ভোগ করিয়া চিরকাল কি প্রকারে পরের উপকার সাধন করিতে পারেন? যখন সহস্র প্রতিবন্ধক দ্বারা আমাদিগের সাধু চেষ্টা প্রতিহত হয় তখন মন নিরাশ-পঙ্কে পতিত হয় কিন্তু সেই সময়ে যদি আমরা মনে করি যে সেই পরম প্রেমাস্পদ আমাদিগের সাধু-চেষ্টার জন্য আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন তখন মনে নূতন জীবন ও নূতন স্ফূর্ত্তির আবির্ভাব হয়।

ঈশ্বর-প্রীতি ধর্ম্মপ্রচারের প্রাণ-স্বরূপ। সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া জন্মভূমি ও প্রিয়জনদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকের পীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করত ধর্ম্ম-প্রচারে ধর্ম্ম-প্রচারককে কে প্রবৃত্ত করে? ঈশ্বর-প্রীতিই প্রবৃত্ত করে। ধর্ম্ম-প্রচারের সময় এমন এক এক বার ঘটে যে আত্মা ইচ্ছুক কিন্তু শরীর আর পারিয়া উঠে না তখন প্রচারকের মনকে নবোৎসাহে উৎসাহিত করিয়া প্রচার-কার্য্যে প্রাণ সমর্পণ করিতে কে প্রবৃত্ত করে? ঈশ্বর-প্রীতিই করিয়া থাকে। যাঁহার মনে প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম উদিত হয় নাই, তিনি যেন ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়েন।

ঈশ্বর-প্রীতি ধর্ম্ম-সমাজ-বন্ধনের একমাত্র উপায়। হাজার নিয়ম-তন্ত্র-প্রণালী সংস্থাপন কর যদি ঈশ্বর-প্রীতি না থাকে, এবং সেই সাধারণ প্রেমাস্পদকে প্রীতি নিবন্ধন আমাদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আন্তরিক প্রীতি না থাকে, তবে ধর্ম্মসমাজ কোন মতেই বাঁধা হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনই বল, ধর্ম্ম-প্রচারই বল, ধর্ম্মসমাজ বন্ধনই বল, সকলের মূল ঈশ্বর-প্রীতি বলিতে হইবে।

আন্দামানদ্বীপবাসীদিগের বৃত্তান্ত।

বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ পূর্ব্বে আন্দামান নামক কতিপয় দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপপুঞ্জ তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে বিভক্ত। উহার অধিকাংশ স্থান নিবিড় অরণ্যে আবৃত। তথাকার অধিবাসিরা নিতান্ত মূর্খ ও অসভ্য, এই জন্য এত দিন তাহারা সভ্যসমাজে সম্পূর্ণ রূপে অপরিজ্ঞাত ছিল। এক্ষণে পোর্ট বেয়ার নামক দ্বীপটী অপরাধিদিগের নির্ব্বাসন-ভূমি রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। উহা আন্দামান

দ্বীপের ঠিক্ দক্ষিণাংশে প্রতিষ্ঠিত। এই সূত্রে আন্দামান দ্বীপবাসীদিগের রীতি চরিত্র কিয়দংশে অবগত হওয়া যায়। সাধারণত ঐ অসভ্য জাতির নাম আন্দামানী। উহাদের বাহ্য, আকার অতি কদর্য্য ও ভীষণ, দেখিলে কোন আগন্তুক লোকের নিশ্চয়ই ঘৃণা ও ভয় উপস্থিত হয়। উহারা এক সময়ে নরমাংসাসী রাক্ষস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তন্নিবন্ধন কেহই সাহস করিয়া ঐ দ্বীপে পদার্পণ করিত না। অধিক কি, সামুদ্রিক নাবিকেরাও ঐ স্থানটী দূরে রাখিয়া যাতায়াত করিত। কিন্তু আন্দামানবাসীরা যে নরমাংসাসী নয় এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। উহাদের বাসগৃহ যৎসামান্য কুটীর মাত্র। উহা তালপত্র দ্বারা প্রস্তুত হয়। ঐ পর্ণকুটীরের ইতস্ততঃ ভক্ষ্য পশুপক্ষী ও মৎস্যের অস্থি এবং শম্বুক সকল স্তূপাকার থাকে। যখন ইহার পূতিগন্ধ অতিশয় অসহনীয় হইয়া উঠে তখন উহারা বাসগৃহ স্থানান্তরিত করে। আন্দামানিরা কিছু খর্ব্বাকার,কিন্তু প্রায় সর্ব্বদাই উলঙ্গ থাকে; কখন কখন বা বৃক্ষের বল্কল লইয়া মস্তক গ্রীবা ও কটিদেশ বন্ধন করে। ইহারা স্বয়ং দিগম্বর এই জন্য অন্য জাতীয় কোন ব্যক্তির পরিচ্ছদ দেখিলে অত্যন্ত ঘৃণা ও হাস্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের স্ত্রীজাতি উলঙ্গ থাকে না। তাহাদের পরিচ্ছদ অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। তাহারা বৃক্ষের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বল্কল পরিধান করে। ঐ বল্কলের সূত্র সকল আজানু লম্বমান হইয়া চন্দ্রাতপের ঝালরের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া থাকে। উহাদের অলঙ্কারের মধ্যে গলদেশে অস্থিমাল্য ও পৃষ্ঠে লম্বিত বল্কল। এই জাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই রক্তবর্ণ এবং ঈষৎ শুভ্রবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া থাকে। ঐ মৃত্তিকা লৌহখনি হইতে উদ্ধৃত, উহা অগ্নিতে দগ্ধ করিলে রক্তবর্ণ হয়। আন্দামানবাসীরা বসার সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অঙ্গরাগ রচনা করিয়া থাকে। উহাদের মস্তক সততই মুণ্ডিত, কিন্তু মস্তকের মধ্যভাগ হইতে গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত রেখাকার কতকগুলি কেশ রক্ষিত হয়। তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ড কিম্বা ভগ্ন কাচ উহাদের কেশচ্ছেদন করিবার অস্ত্র। যুবতীদিগের কেশধারণ করিবার রীতি আছে, কিন্তু বৃদ্ধা স্ত্রীরা প্রায়ই মস্তক মুণ্ডন করে। পুরুষেরা শ্মশ্রুবিহীন; এমন কি, ভ্রূযুগলেও কেশ রক্ষা করে না। আণ্ডামান দ্বীপে এত অধিক দংশ মশকের উপদ্রব যে কেশবিহীন না হইলে ঐ সমস্ত কীট সতত মনুষ্য-শরীরে গিয়া বাস করে। আন্দামানিদিগের সর্ব্বশরীরে বিচিত্র উল্কী। অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম হইলেই উহারা সর্ব্বাঙ্গ উল্কী দ্বারা চিত্রিত করিয়া থাকে। এই উল্কী-গ্রহণের প্রক্রিয়া অতি নিষ্ঠুর। তীক্ষ্ণ প্রস্তরখণ্ড কিম্বা ভগ্ন কাচ দ্বারা গাত্রের ত্বক প্রায় এক বুরুল বিদ্ধ করিতে হয় এবং তদ্দ্বারাই দেহের অপূর্ব্ব শ্রী সাধন হইয়া থাকে; কিন্তু উহারা ব্রহ্মদেশীয়দিগের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে মূর্ত্তি অঙ্কিত করে না। উল্কী-গ্রহণ কালে উহাদের দেহ হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হয় কিন্তু তাহারা ঐ রক্তপাতে ভ্রূক্ষেপও করে না। সর্ব্বাঙ্গ চিত্রিত হইলে পর উহাদের বিবাহে অধিকার জন্মে। কিন্তু যত দিন না প্রতিপালনে সক্ষম হয় ততদিন তাহারা বিবাহ করে না। উহাদের মধ্যে অধিবেদন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের ত্রয়োদশ ও পুরুষের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলেই বিবাহ হয়। বিবাহের নিয়ম ও প্রণালী অতি সামান্য। কোন যুবা প্রথমত ভিন্ন বংশীয় কোন কামিনীকে মনোনীত করিয়া তাহার পিতা মাতার সম্মতি গ্রহণ করে। পরে বিবাহের দিবস পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক

পৃথক পৃথক বসিয়া থাকে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সম্প্রদাতা কন্যার হস্তের সহিত বরের হস্ত মিলিত করিয়া দেন। তখন নব-বিবাহিত দম্পতী কাননমধ্যে রাত্রি যাপন করিবার নিমিত্ত নির্গত হয়। পরে প্রত্যাগমন করিলে সমস্ত জ্ঞাতি কুটুম্ব আনন্দ-ধ্বনি ও নৃত্যগীত উৎসব সহকারে তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকে।

অনন্তর বিবাহিতা স্ত্রী ভর্ত্তৃগৃহে উপস্থিত হইয়া দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। ঐ সমস্ত গার্হস্থ্য কার্য্য শ্রমসাধ্য হইলেও তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা বহন করিয়া থাকে। পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ ও গৃহের অবান্তর সমস্ত কার্য্য তাহাদিগকেই সম্পন্ন করিতে হয়। উহারা শম্বুকাদি জল জন্তু সঙ্গ্রহ করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া প্রতি দিবসই সমুদ্র-তীরে গমন করে। পরে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সংগৃহীত শম্বুক এবং মৃগয়ালব্ধ বন্য পশুমাংস রন্ধন করিয়া থাকে। তাহারা স্বামীর মস্তক মুণ্ডন ও খনিজ মৃত্তিকা দ্বারা অঙ্গরাগ রচনা করিয়া দেয় এবং শয়নোপযোগী মাদুর প্রস্তুত করে। আন্দামানদ্বীপে বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ অবৈধ নহে; এমন কি, তাহারা স্বামীর মৃত্যুর এক মাস মধ্যেই বিবাহ করিয়া থাকে। কামিনীগণ প্রসবান্তে শিশুসন্তানকে প্রথমতঃ শীতল জলে স্নান করাইয়া পরে অগ্নিশিখায় উত্তপ্ত করে। এই নিয়ম তাহাদের মধ্যে অতিশয় আদৃত, কারণ শীত উত্তাপাদি সহিষ্ণুতা যৌবনে অতিমাত্র বলাধানের কারণ হয়, ইহাই তাহাদিগের বিশ্বাস। ইহাদের পুত্রবাৎসল্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়। স্ত্রীলোকেরা শিশুকে পৃষ্ঠে লইয়া এতদ্দেশীয় নাগপুরের পার্ব্বত্য জাতির ন্যায় সতত বিচরণ করে। আন্দামানদিগের মধ্যে নামকরণ-প্রথা প্রচলিত আছে। তাহারা বংশের এক ব্যক্তির নাম ধরিয়া পুত্র কন্যার নাম রাখে, কিন্তু তাহাদিগের ভাষায় নামের সংখ্যা অল্প থাকায় প্রভেদ নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত নূতন নামের অগ্রে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সূচক কোন শব্দ প্রয়োগ করে। ইহাদের বালক বালিকারা জলে ও জঙ্গলে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রায়ই অকাল-মৃত্যু সহ্য করিতে হয়; এমন কি, আন্দামানিগণের মধ্যে দুই বা তিনটির অধিক সন্তান কাহারও জীবত থাকে না। ফলত উহাদের মধ্যে কেহই সুস্থ ও দীর্ঘজীবি নহে। অনেকেই ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। ঐ স্থান অত্যন্ত জঙ্গলময়, উহারা নিরবচ্ছিন্ন তথায় বাস করিয়া ভয়ানক জ্বরে সতত আক্রান্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যের প্রখর কিরণ ও সামুদ্রিক তীব্র বায়ু তাহাদিগের শরীর ত্বরায় জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলে। বর্ষাকালে দুরন্ত জ্বর ও উদরের পীড়া অত্যন্ত প্রবল হয়। কিন্তু উৎকট পীড়ার সময়েও আন্দামানিরা কদাচ কোন রূপ ঔষধ সেবন করে না। তাহারা কেবল রক্তবর্ণ মৃত্তিকা গাত্রে লেপন করাকেই প্রধান ঔষধ বলিয়া মনে করে, সুতরাং অকাল মৃত্যু তাহাদের মধ্যে প্রায়ই বিচরণ করিয়া থাকে। এই অকাল-মৃত্যু জন্য তাহাদিগের সংখ্যাও বিরল। মৃত্যুর পর আন্দামানবাসীরা মৃত দেহ মৃত্তিকা মধ্যে সমাধি করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার আত্মীয়গণ মৃত দেহ পত্রাবৃত করিয়া বৃক্ষত্বকের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্র দিয়া বন্ধন করে। পরে এক হস্তপ্রমাণ গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক শবকে উপবেশন করাইয়া পূর্ব্বাস্যে রক্ষা করে। অনন্তর মৃত্তিকা ও প্রস্তর দ্বারা ঐ দেহ প্রোথিত করিয়া তদুপরি বারিপূর্ণ একটী পাত্র রাখিয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস এই যে প্রেতাত্মা রজনীতে ঐ জল পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিয়া

থাকে। তাহাদের মধ্যে যদি কোন মণ্ডলাধিপতির মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহার সমাধির উপর পুষ্পমালা ও প্রজ্বলিত অগ্নি স্থাপন করা হয় এবং তাহার দেহ সমাধি করিবার অগ্রে সকলে সমবেত হইয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকে। আন্দামানবাসীরা শ্মশান স্থানে বাস করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক, কারণ তাহারা প্রেতযোনিকে অত্যন্ত ভয় করে। কিন্তু কোন ভিন্ন জাতীয় লোকের মৃত্যু হইলে তাহার মৃত দেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করা হয় এবং তাহার প্রেতযোনিকেও ইহারা ভয় করে না। এই অসভ্য জাতি ধর্ম্মশূন্য নহে। ইহারা প্রতিপদের দিন চন্দ্রকলা দর্শন করিয়া তাহাকে আবাহন পূর্ব্বক নৃত্য গীত করিয়া থাকে।

আন্দামানদ্বীপে শস্যোৎপাদনের রীতি নাই। অধিবাসীদিগের মৃগয়ালব্ধ গণ্ডার, সমুদ্রের মৎস্য, কূর্ম্ম ও শম্বুকাদি জীব এবং ফল মূল প্রধান উপজীবিকা। বন্য জন্তুর মধ্যে বরাহ-মাংসকে তাহারা অতিশয় প্রীতিপ্রদ বোধ করে। শীতকালই মৃগয়ার প্রশস্ত কাল। উহারা মৃগয়া-কালে ধনুর্বাণ ব্যবহার করিয়া থাকে। শুক্ল পক্ষে মৎস্য কচ্ছপ প্রভৃতি জলজন্তু সকল অধিক পরিমাণে ধৃত হয়, কিন্তু তাহারা উহা শুষ্ক বা লবণ-মিশ্রিত করিয়া রাখে না, এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করে না। এই জাতি সন্তরণে বিলক্ষণ পটু। ইহারা জাল বা টাঁটা দ্বারা মৎস্য ধরিয়া থাকে, এবং সমুদ্রোপরি বিচরণ করিবার নিমিত্ত শালতি বা ডোঙ্গা ব্যবহার করে। মৎস্য ধরিবার প্রণালীও ইহাদের অতি সহজ। ইহারা শালতী বা ডোঙ্গায় আরোহণ করিয়া লৌহফলকযুক্ত টাঁটা লক্ষ্যের উপর নিক্ষেপ করে। পরে লক্ষ্য বিদ্ধ হইবামাত্র ঐ লৌহফলক বংশদণ্ড হইতে পৃথক হইয়া যায়, কিন্তু লৌহ-ফলকের সহিত একটী সুদীর্ঘ সূত্র সংযুক্ত থাকাতে বিদ্ধ মৎস্য সহজেই গৃহীত হয়। উহারা এই কার্য্যে এমনি সুদক্ষ যে উহাদিগের লক্ষ্য প্রায় ব্যর্থ হয় না। এতদ্ব্যতীত মধুক্রম ভগ্ন করিবার কালে এই অসভ্যদিগের বিশেষ কৌশল দৃষ্ট হয়। ইহারা প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা মধুমক্ষিকাদিগের প্রাণ নষ্ট করে না। প্রথমত সকলে এক প্রকার উদ্ভিজ্জ চর্ব্বন করে। পরে তাহার রস মুখমধ্যে পূর্ণ করিয়া ফুৎকার দ্বারা মক্ষিকাদিগের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ উদ্ভিদ্-রসের মাদকতা শক্তি আছে। মধুমক্ষিকাগণ তৎপ্রভাবে উন্মত্ত হইয়া উড়িয়া যায়। ইত্যবসরে ঐ জাতীয়েরা সহজে মধুক্রম ভগ্ন ও মধুসংগ্রহ করে। ইহারা কি পশুমাংস, কি মৎস্য, কি ফল মূল, সমস্ত দ্রব্যই অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া কিম্বা পাক করিয়া ভোজন করে। অপক্ক বা অগ্নিসংস্কার ব্যতীত প্রায় কোন দ্রব্যই ইহারা ব্যবহার করে না। আন্দামানবাসীরা অতিশয় সুচতুর। তাহাদিগের স্মরণ-শক্তি বিলক্ষণ আছে। ভিন্ন দেশবাসীরা উহাদিগকে যে নামে আহ্বান করিয়া থাকে উহারা তাহা কিছুতেই বিস্মৃত হয় না। বহু দিবসের পর যদি কোন বন্ধু-বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে উহারা আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকে। শত্রুর সহিত সম্মিলন হইলেও এই রীতি অনুসৃত হয়। তন্মধ্যে কামিনীগণ সর্ব্বাগ্রে অশ্রুপাত করে, পরে সকলে একত্রিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে থাকে। নৃত্য ও সঙ্গীত তাহাদিগের অতিশয় আদরণীয়। কোন আনন্দোৎসবে রমণীরা প্রথমে নৃত্য করে। পরে পুরুষেরা সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া করতালি-যোগে নৃত্য করিতে থাকে।

আন্দামানবাসীদিগের ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে শালতি ও ধনুর্বাণ সর্ব্বপ্রধান। ইহারা

সমুদ্রোপরি বিচরণ করিবার নিমিত্ত শালতি ব্যবহার করিয়া থাকে। উক্ত জলযানের সৌন্দর্য্য সম্পাদনের জন্য উহার পার্শ্বদেশ চিত্র বিচিত্র করা হয় এবং অত্যন্ত ভঙ্গুর বলিয়া যত্নের সহিত তাহা রক্ষিত হইয়া থাকে। শালতি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, বিংশতি ব্যক্তি উহাতে অনায়াসে আরোহণ করিতে পারে এবং ত্রিশ জনের খাদ্য দ্রব্য পূর্ণ করিলেও উহা ভারাক্রান্ত হইয়া জলমগ্ন হয় না। মৎস্য ও কচ্ছপ ধরিবার জন্য ঐ শালতি সততই ব্যবহৃত হয়। এতৎ ব্যতীত সমুদ্রোপরি গমনাগমনের নিমিত্ত আর উপায় নাই। আন্দামানদ্বীপবাসীরা শরনিক্ষেপে এমন নিপুণ যে তাহাদিগের সন্ধান কখন ব্যর্থ হয় না। উহাদিগের ভাষা অতি গ্রাম্য ও অসভ্য। শব্দের স্বল্পতা নিবন্ধন ঐ ভাষা বিদেশীয় ব্যক্তির সহজে বোধগম্য হয় না। বিশেষতঃ ভাষার মধ্যে সংখ্যাবাচক শব্দ না থাকায় তাহাদিগের গণনীয় বস্তুর সংখ্যা কোন রূপে বুঝা যায় না। ঐ ভাষা তাহাদিগের স্বজাতীয়ের মধ্যেও আবার এত বিভিন্ন যে পূর্ব্ব আন্দামানবাসীরা দক্ষিণ আন্দামানের কথা বুঝিতে পারে না। লেখা তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। তাহারা অন্য ব্যক্তিকে লিখিতে দেখিলে চমৎকৃত ও বিস্মিত হয় এবং লিপি দ্বারা ভাব প্রকাশ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া অন্যের লেখা দর্শনে হাস্য করিয়া থাকে।

মানব জাতির প্রাচীনত্ব।

মনুষ্য সর্ব্ব প্রথম কোন্ সময়ে, কোন্ অবস্থায় এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহন করিল তদ্বিষয়ে এত দিন কেহই কিছু স্থির করিতে পারে নাই। হিন্দু, ইহুদি, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য জাতিরা এই বিষয়ে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে তাঁহারা অনুমান ও কল্পনা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে স্ব স্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত সকলে ঐ প্রাচীন মতেরই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখন সেই সমস্ত অপসিদ্ধান্ত অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যতীত আর কেহই সম্ভবপর বা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন না। এক্ষণে অনেক সূক্ষ্মবুদ্ধি সুধীগণ অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত ভূতত্ত্ব-বিদ্যার অনুশীলন ও উন্নতি সাধন করিতেছেন। এই ভূতত্ত্ব বিদ্যার আবির্ভাবে মনুষ্যের উৎপত্তিকাল বিষয়ক প্রশ্নটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক রীতিতে নির্ণীত হইতেছে। এই বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আদিম অবস্থা এবং মনুষ্যের পুরাতত্ত্ব-সংক্রান্ত অনেক বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে। ঐ সমস্ত যুক্তিপ্রসূত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে কৃতবিদ্যগণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ কিম্বা গ্রীক ও রোমকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে বিবৃত অনুমান ও কল্পনা-প্রসূত মনুষ্যের উৎপত্তি ও আদিম বৃত্তান্ত আর কেহ বিশ্বাস করেন না। এক্ষণে আধুনিক বিজ্ঞানসিদ্ধ মতটি কি তাহাই আমরা এই প্রস্তাবে বিবৃত করিব।

আমরা ভূতত্ত্ব বিদ্যার সাহায্যে জানিতে পারি যে এই পৃথিবী এক কালে ইহার বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হয় নাই। আমরা পৃথিবীকে এখন যেরূপ দেখিতেছি চিরকাল ইহা এরূপ ছিল না। ইহা যে কত সহস্র সহস্র পরিবর্ত্তনের পর বর্ত্তমান আকারে উপনীত হইয়াছে তাহা স্থির করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। এই পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথমে যে জীব আবির্ভূত হয় তাহা মনুষ্য নহে, মনুষ্যের আবির্ভাব-কালের বহু পূর্ব্ব হইতে

নানা প্রকার জীব জন্তু যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া এই পৃথিবীতে বাস করিয়াছিল। সেই সমস্ত জীব জন্তুর বংশ অতীতের গর্ভে ধ্বংস হইয়াছে। খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তকে মনুষ্যের জন্ম কাল পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় সহস্র বৎসর বলিয়া যে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, মনুষ্য এই পৃথিবীতে বহু সহস্র সহস্র বৎসর হইল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই বাক্য সপ্রমাণ করিবার জন্য ভূতত্ত্ববিদেরা যে সকল যুক্তি ও কারণ দেখাইয়া থাকেন আমরা এক্ষণে তাহার দুই একটীর উল্লেখ করিব।

পরলোকগত বিখ্যাতনামা ইংরাজ ভূতত্ত্ব বিদ্যাবিৎ মহাপণ্ডিত সার চার্লস লায়েল স্বপ্রণীত "মানবজাতির প্রাচীনত্ব" নামক গ্রন্থে মনুষ্য যে বহুকাল হইল এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অকাট্য প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা অদ্যাবধি কোন ভূতত্ত্ববিদ্যাবিৎ পণ্ডিত খণ্ডন করিতে পারেন নাই। দেনমার্ক, সুইজরলণ্ড, ইতালী, আয়ার্লণ্ড প্রভৃতি দেশের ভূগর্ভ খনন করিয়া যে কয়েকটি স্তরের নিম্নে মনুষ্যের অস্থি ও মনুষ্য-হস্ত-নির্ম্মিত মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী নানা অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ভূতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন সে সকল স্তর প্রস্তুত হইতে বহু সহস্র বৎসর লাগিয়াছে। ঐ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় যে তৎকালীন মনুষ্য মৎস্য ধরিত, কৃষিকার্য্য করিত ও বস্ত্র-বয়ন অভ্যাস করিয়াছিল। ঐ স্তরের অধস্তন আরও দুই এক স্তরের নিম্নে মাষ্টোডন ও এল্‌ক নামক পশুর মৃতদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাহার সঙ্গে মনুষ্যের ব্যবহার্য্য নানা প্রকার অস্ত্রও পাওয়া যায়। লায়েল সাহেব আরও নিম্নতম স্তরে মনুষ্যের অস্থি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ স্তর রচিত হইবার কালেও মনুষ্য বর্ত্তমান ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের সার জন লবক, ফ্রান্সের দেসনয়ার, ষ্টীনষ্ট্রুপ, ও বুর্গয় এবং ইতালীর রেমোরিনো প্রভৃতি বর্ত্তমান সময়ের সুপ্রসিদ্ধ ও বিচক্ষণ ভূতত্ত্ববিদেরা সার চার্লস লায়েল যে সকল মতে উপনীত হন সেই সকল মত সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সার চার্লস লায়েল তৃতীয় সংখ্যক স্তরের নব (Pliocene) ভাগে মনুষ্যের অবস্থিতির যে নিদর্শন পাইয়াছেন, সুবিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্যাবিৎ সারজন লবক যিনি কোন বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া কোন রূপ মতামত প্রকাশ করেন না তিনি ঐ স্তরের তদপেক্ষা নিম্ন অর্থাৎ মধ্য (Miocene) ভাগে মনুষ্যের অবস্থিতির বিশেষ নিদর্শন পাইয়াছেন। এসিয়া খণ্ডে মনুষ্য সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভূত হয়, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইউরোপ খণ্ডে যে স্তরে মনুষ্যের অবস্থিতির নিদর্শন পাওয়া যায় সেই স্তর তুষার-প্রধান-কাল অর্থাৎ যে কালে পৃথিবীর দক্ষিণভাগ বরফে আবৃত ছিল সেই কালে সর্ব্বোপরিস্থ ছিল। লায়েল প্রভৃতি ভূতত্ত্ববিদেরা বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐকাল বর্ত্তমান শতাব্দীর আট লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ছিল। অতএব ইউরোপ খণ্ডে মনুষ্য আট লক্ষ বৎসর হইল সর্ব্ব প্রথমে আবির্ভূত হয়। এইরূপ ভূতত্ত্ববিদ্যার চর্চ্চার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকেরা মনুষ্য জাতির প্রাচীনত্বের অসংখ্য নিদর্শন পাইয়াছেন এবং এপর্য্যন্ত ঐ বিদ্যা যতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহাতে উহা মনুষ্যজাতির উৎপত্তির সময় যে সাধারণ-বিদিত সময় অপেক্ষা বহুকাল পূর্ব্বে তাহা বিশেষ রূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। যাঁহারা ভূতত্ত্ববিদ্যা সুচারুরূপে অধ্যয়ন না করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট মনুষ্য জাতি এই পৃথি-

বীতে আট লক্ষ কিম্বা দশ লক্ষ বৎসর বাস করিতেছে, ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তিরা যদ্যপি ঐ বিদ্যা ও উচ্চ বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন ও বুঝিতে পারিবেন যে আট লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে মনুষ্যের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছে ইহা অলৌকিক ও অসম্ভব কথা নহে। ভূতত্ত্ববিদ্যাবিৎ বৈজ্ঞানিকগণের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অসম্ভব বলিয়া স্থির করিবার অগ্রে আমরা যেন তাঁহাদিগের প্রদত্ত কারণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।

এক্ষণে আমরা আদিম মনুষ্যের অবস্থার বিষয় কিছু বলিব। আট লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে তুষার-প্রধান কালে যে সকল মনুষ্য ছিল তাহাদিগের অবস্থার বিষয় জানিবার আমাদিগের কোন উপায় নাই। কিন্তু আট নয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তরের কাল (Stone Age) পিত্তলের কাল (Bronze Age) প্রভৃতি কালের মনুষ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল ভূতত্ত্ববিদেরা তদ্বিষয়ে অনেক জানিতে পারিয়াছেন। ভূতত্ত্ববিদেরা যে সময়কে প্রস্তরের কাল (Stone Age) আখ্যা দিয়াছেন সেই কাল দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—প্রথম পুরা-প্রস্তর (Pleiolithic) ও দ্বিতীয় নবপ্রস্তর (Neolithic) কাল। পুরা-প্রস্তর কালের যে সকল প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে সে সকল অস্ত্র সুচারুরূপে গঠিত নহে। আর নব-প্রস্তর কালের যে সকল প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে সে সকল অতি সুচারূপে নির্ম্মিত ও গঠিত। স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে এই কালে কোন খনিজ ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যাইত না, কেবল প্রস্তর বহুল রূপে পাওয়া যাইত। অতএব তৎকালীন মনুষ্যেরা তাহাদিগের আবশ্যক অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মাণ করিত। এই কালের পরবর্ত্তী কালকে ভূতত্ত্ববিদেরা পিত্তলের কাল (Bronze Age) আখ্যা প্রদান রিয়াছেন। এই কালে পিত্তল বহুল রূপে পাওয়া যাইত। এই কালের পিত্তল-নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রও ভূতত্ত্ববিদেরা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সুইজারলণ্ডের হ্রদনিবাসীদিগের বাসস্থানের চিহ্ন যে স্তরে পাওয়া যায় সেই স্তর নব প্রস্তর কালের সমকালবর্ত্তী। হ্রদনিবাসীদিগের বাসস্থানের মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত নানা অস্ত্র ব্যতীত মৃত্তিকানির্ম্মিত কৃষিকার্য্যোপযোগী নানাবিধ যন্ত্র ও চিত্রিত নানা প্রকার মৃণ্ময় পাত্র পাওয়া গিয়াছে। সুইজারলেণ্ডের হ্রদনিবাসীদিগের ব্যবহৃত যে সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে তদ্দ্বারা তাহাদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। তাহারা কেবল হ্রদস্থ মৎস্য ভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণ করিত না। তাহারা কয়েক প্রকার শস্য বিশেষতঃ মিসরদেশীয় গোধূম উৎপাদন করিত। তাহারা যে প্রকার রুটি প্রস্তুত করিত তাহার ও নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহারদিগের সময়ে সেও, নাসপতি, জাম, মটর, ও রেস্পবেরি, হেজেলনট, বিচনট প্রভৃতি নানাজাতীয় ফল উৎপন্ন হইত। তাহারা কৃষিকার্য্য করিবার জন্য কি প্রকার অস্ত্র সকল ব্যবহার করিত তাহা জানিবার উপায় নাই। তৎকালের যে সকল পশুর অস্থিময় দেহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাদিগের নাম সারজন লবক উল্লেখ করিয়াছেন। বন্য পশুর মধ্যে ভল্লুক, ব্যাঘ্র, শৃগাল, বিবর, হরিণ, এল্‌ক জাতীয় হরিণ, বাইসন, বন্য বরাহ, নকুল, বন্য বিড়াল, ও গন্ধকোকুল, এবং গৃহপালিত পশুর মধ্যে ঘোটক, গাভী, ছাগল, মেষ ও কুক্কুর। উপরোক্ত বন্য পশু সকল প্রস্তরের কালে অধিক সংখ্যক ছিল। কিন্তু পিত্তলের কালে হরিণ ব্যতীত অন্য কোন বন্য

পশু ছিল না। কত বৎসর পূর্ব্বে উক্ত প্রস্তরকালে স্বইজারলেণ্ডের হ্রদনিবাসীরা বর্ত্তমান ছিল তাহা কয়েকটি ফরাসী দেশীয় বৈজ্ঞানিক স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মরলো বলেন যে ইহারা ৬৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ঐবং গিলিরোঁ বলেন যে ইহারা ৬৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। সার জন লবক বলেন "মরলো ও গিলিরোঁ নামক ফরাসীস বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের সিদ্ধান্তে সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে ৬০০০ কিম্বা ৭০০০ বৎসর পূর্ব্বে স্বইজারলেণ্ডের হ্রদনিবাসীরা বর্ত্তমান ছিল. কিন্তু কত কাল তাহারা ঐরূপ অবস্থায় থাকিয়া পরে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় তাহা আমরা কোন রূপেই নিশ্চয় করিতে সমর্থ নহি।"

দেনমার্কের কিচেনমিডেন (Kitchen-middens or shell-mounds) কিম্বা শঙ্খস্তূপ আদিম মনুষ্যদিগের অবস্থা জানিবার একটি প্রধান উপায়। ঐ প্রকার শঙ্খস্তূপ স্কটলেণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, টিরাডেল ফিউগো দ্বীপ, মালে উপদ্বীপ, এবং দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর নানা স্থানে দেখা গিয়াছে। দেনমার্কে যে সকল স্তূপ আছে তাহাতে অগ্নিপ্রস্তর-নির্ম্মিত নানা প্রকার অস্ত্র বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল স্তূপে যে সমুদায় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা এই প্রতীতি হয় যে, যে সকল মনুষ্য ঐ সকল স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারা স্বইজারলেণ্ডের হ্রদনিবাসীগণ অপেক্ষা অধিকতর অসভ্য ছিল। তাহারা কৃষিকার্য্য কিছুমাত্র করিতে পারিত না এবং ইহাদিগের কুক্কুর ব্যতীত অন্য কোন গৃহপালিত পশু ছিল না। কিন্তু তাহারা মৎস্য ধরিতে অতি পটু ছিল, কারণ ঐ সকল স্তূপে অনেক প্রকার মৎস্যের অস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যে সকল মৎস্যের দেহ ও অস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সে সকল মৎস্য সমুদ্রের গভীরতম স্থানে বাস করিয়া থাকে। যখন ইহারা সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশবাসী মৎস্য সকল ধৃত করিত তখন নিঃসন্দেহই ইহারা নৌকা নির্ম্মাণ ও নৌকাচালন-বিদ্যা অবগত ছিল।

ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত)

পারিস্ নগর-প্রবাসী কোন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনশীল শ্রেষ্ঠ-কুলোদ্ভব হিন্দু যুবক সম্প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি মহাশয়কে যে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন ও সেই পত্র-সম্বলিত রাজনৈতক স্বাধীনতা ও ভারতবর্ষীয়দিগের দ্বারা তৎ-লাভের বিশিষ্ট উপায় বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় যে একটি যুক্তিগর্ভ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা গত ভাদ্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকটিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি উপাদেয় ও সময়ের উপযোগী।

তিনি বলেন "ইহা অতি সুখের বিষয় যে শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আজ কাল একটি স্বাধীনতার ভাব উদ্বোধিত হইতেছে এবং এই স্বাধীনতার ভাব আমরা ইংরাজদিগের নিকট হইতেই শিক্ষা পাইয়াছি। ইংলণ্ডের সংশ্রবে যদি আমরা আর কোনও উপকার না পাইয়া থাকি অন্তত এই উপকারটি আমাদের সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই যে জাতীয় স্বাধীনতার ভাব ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতেছে ইহাতে আমাদের যতই আহ্লাদ হউক না কেন—

আমাদের আর একটি দিক আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল নিয়ম পালন না করিলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, সেই সকল নিয়ম পালন পক্ষে কত দূর চেষ্টা হইতেছে? এখন তো কেবল স্বাধীনতা বিষয়ে সভায় মহা আড়ম্বরে বক্তৃতা হইতেছে—সংবাদপত্রে অনর্গল লেখা চলিতেছে এবং কবিতা নাটকের ছড়াছড়ি হইতেছে—কিন্তু কাজে কি হইতেছে? আমাদিগের স্বদেশ-বৎসলদিগের দেশানুরাগ কি শুদ্ধ বাক্যেই বদ্ধ থাকিবে? বক্তৃতা কবিতা প্রভৃতির উপকারিতা আছে বটে কিন্তু উহাই কি যথেষ্ট?—উহার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য চাই। যে সকল কার্য্যগত উপায়ে স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে, তাহা অবলম্বন করা আবশ্যক। স্বাধীনতা লাভের যে সকল নির্দ্দিষ্ট অকাট্য নিয়ম আছে অগ্রে তাহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।” অবিকল অনুবাদ না করিয়া আমরা তাঁহার প্রবন্ধের প্রথমাংশের স্থূল মর্ম্ম ব্যক্ত করিলাম। এবং এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কিন্তু তার পরেই তিনি এই মর্ম্মে বলিতেছেন যে “জোর যার মুলুক তার” কিম্বা “বল যার অধিকার তার” এই নিয়মটি উদ্ভিদ্ জগতে, জীব জগতে, এমন কি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে কার্য্য করিতেছে। বলবান দুর্ব্বলের স্থান অধিকার করিবেই করিবে। ডার্‌উইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মই এই। এই নিয়মটি যেমন প্রকৃতির মধ্যে তেমনি মনুষ্য-সমাজে বিলক্ষণ খাটে। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য-স্থল। যাঁহার বল আছে তাঁহারই অধিকারের কথা মুখে আনিবার অধিকার আছে। “Only he dares speek of right or rights who has might, exclaims she in her Book of Revelations which we term History.” প্রকৃতি জননী অথবা ইতিহাসের এই শাসন-বাক্য যিনি লঙ্ঘন করিতে সাহসী হন তিনি তাহার ফলভোগ করুন—অবাধ্য শিশুর ন্যায় বেৎ খাইয়া আবার সিধা পথে ফিরিয়া আইসেন।’ কিন্তু আমরা লেখক মহাশয়ের এই মতের সহিত সম্পূর্ণরূপে সায় দিতে পারি না। “জোর যার মুলুক তার’—এই নিয়ম উদ্ভিদজগতে, পশুজগতে এবং পশুবৎ অপূর্ণ পূর্ব্বতন মানব সমাজে খাটিতে পারে কিন্তু সভ্য সুপ্রতিষ্ঠ মনুষ্য-সমাজে এ নিয়ম শোভা পায় না। এই নিয়মের নেতৃত্ব ও ঔচিত্য স্বীকার করিলে সভ্য-সমাজের একেবারে ভিত্তিমূলে আঘাত করা হয়। এই নিয়ম'নুসারে সম্পূর্ণরূপে চলিতে গেলে অরাজকতা বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়া সমাজ-বন্ধন একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এ নিয়মকে প্রশ্রয় দিলে চৌর্য্য দস্যুতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এক জন বলবান দস্যু এক জন দুর্ব্বলের ধন বলপূর্ব্বক অপহরণ করিলে সেই ধনে কি ঐ দস্যুর অধিকার জন্মে; “বল যার অধিকার তার” এই নীতিসূত্রটি মানিতে গেলে ঐ দস্যুর অপহৃত ধনে অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিবেন? এইরূপ যদি কোন বলবান জাতি কোন দুর্ব্বল জাতির দেশ কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে সেই জাতি কি দস্যুতা অপরাধে অপরাধী নহে? এক জন সামান্য দস্যুর সহিত তাহার প্রভেদ কি? সংখ্যায় অধিক এই মাত্র। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকারের যে মূল নিয়ম, জাতিগত সম্পত্তি-অধিকারেরও যে সেই একই মূল নিয়ম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে দেশের যে অধিবাসী, সেই দেশ সেই অধিবাসীদিগের স্বাভাবিক ন্যায্য সম্পত্তি।

এই রূপ যদি দেশ-অধিকারের ন্যায়-সঙ্গত একটি স্বাভাবিক নির্দ্দিষ্ট সীমা না থাকে, বলই যদি অধিকারের নিয়ম হয়—তাহা হইলে পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহের আর অবধি থাকে না। যুদ্ধানল চিরকালই প্রজ্জ্বলিত থাকে—"সভ্যতা" বলিয়া একটি শব্দ আর মানব-ইতিহাসে কুত্রাপি স্থান পায় না।

মানব সমাজের সভ্যতা বা উন্নতির ইতিহাসকে তিনটি কালে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম।—সংগ্রাম-প্রধান কাল।
দ্বিতীয়।—স্বার্থ-প্রধান কাল।
তৃতীয়।—ন্যায়-ধর্ম্ম-প্রধান কাল।

আর এক কথায়—

প্রথম।—তামসিক কাল।
দ্বিতীয়।—রাজসিক কাল।
তৃতীয়।—সাত্ত্বিক কাল।

সাঙ্গ্রামিক কালের বহু পূর্ব্বের যে কাল, সে কাল মনুষ্য-সমাজের ইতিহাসে ধর্ত্তব্যই নহে—যেহেতু সে সময়ে মনুষ্যের সমাজ-বন্ধন আদৌ হয় নাই। যখনি রীতিমত যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে, তখনই বুঝা যাইতেছে মনুষ্যদিগের মধ্যে একটি সম্মিলনের ভাব উৎপন্ন হইয়াছে, কারণ বিনা সম্মিলনে বৃহৎ যুদ্ধ ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে না এবং যখনি মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর সম্মিলন আরম্ভ হইয়াছে, তখনই বলিতে হইবে সমাজ-বন্ধন কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। সাঙ্গ্রামিক কালে, কোন কোন জাতির মধ্যে কোন কোন বলবান পুরুষ উত্থিত হইয়া কতক সংখ্যক লোককে আপনার কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া শুদ্ধ আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিবার জন্যই কিম্বা কোন নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই, অন্য জাতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত, তখন প্রধানতঃ শারীরিক বলেরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এই যুদ্ধবিগ্রহে সে সময়ে মনুষ্য-সমাজের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছিল। যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা মানব-সমাজে বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে প্রথম সংমিশ্র আরম্ভ হইল, বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বলের বৃদ্ধি হইল, পরস্পরের ভাল পরস্পর অনুকরণ করিতে লাগিল, জেতৃজাতি বিজিত জাতির নিকট কতকটা উপকার লাভ করিল, এবং বিজিত জাতিও জেতৃ জাতির নিকট অনেক বিষয়ে উপকৃত হইল। সংগ্রামের অনেক অশুভ ফল সত্ত্বেও সকল কালেই বিশেষতঃ অসভ্যকালে ইহারও যে বিশিষ্ট উপকারিতা আছে তাহা কেনা স্বীকার করিবে। এই যুদ্ধবিগ্রহ হইতেই বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে সম্মিলন আরম্ভ হয়, বাণিজ্যের সূত্রপাত হয় এবং এই রূপে জনসমাজ সভ্যতার দ্বিতীয় সোপানে উত্থিত হয়।

সভ্যতার এই দ্বিতীয় কাল, জাতীয় স্বার্থের কাল। সাংগ্রামিক কালের লোকে যে রূপ প্রধানতঃ নীচ প্রবৃত্তির অধীন হইয়াই অন্য জাতির সহিত সংগ্রাম করে, যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ করে, রক্তের পিপাসু হইয়াই রক্তপাত করে, একালের লোক সেরূপ করে না। একালে যুদ্ধ-বিগ্রহ উচ্চতর স্বার্থের অধীন। স্বজাতীয় ধন লাভের পন্থা করিবার জন্য, বাণিজ্যের সুবিধা করিবার জন্য, এক কথায় উচ্চতর স্বার্থের জন্য যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ আবশ্যক হয়, তবেই এই কালের লোক যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়।

ক্রমে পৃথিবীতে যত জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হয় ততই ব্যক্তিগত নীচ প্রবৃত্তি সকল মন্দীভূত হয়, জাতিগত অতিরিক্ত স্বার্থপরতার হ্রাস হয়, তখন এক জাতির স্বার্থ অপর জাতির স্বার্থের সহিত বিরোধী হয় না, প্রত্যুত সকল জাতির এক স্বার্থ হইয়া উঠে, তখন ন্যায় ধর্ম্ম মঙ্গলের অখণ্ড রাজত্ব পৃথি-

বীতে স্থাপিত হয়, তখন আর শারীরিক বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না, তখন পৃথিবীর সকল জাতিই পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ্য সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পৃথিবীতে নির্ভয়ে সুখে সঞ্চরণ করে। কিন্তু এই ন্যায়-ধর্ম্মপ্রধান কাল, এই সাত্ত্বিক কাল, এই সত্যকাল, এই স্বর্গীয় কাল, পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। এত বিলম্ব যে, সে এখন আমাদের কল্পনাতেও আইসে না। কিন্তু সমস্ত মানব-সমাজের গতি যে ঐ দিকে, তাহার নিদর্শন এখন হইতেই পাওয়া যাইতেছে।

সমগ্র পৃথিবী যত দিন না সভ্যতার এক সমভূমে দণ্ডায়মান হইবে ততক্ষণ এই ন্যায় ধর্ম্মের কাল পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইবে না। পৃথিবীর একাংশে যদি এই জ্ঞান ধর্ম্মকাল অবির্ভূত হয়, আর অন্য ভাগে যদি সাংগ্রামিক কাল কিম্বা স্বার্থকাল বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে যে অংশে জ্ঞান ধর্ম্ম কালের আবির্ভাব হইয়াছে সে কাল সেখানে কখন বহুদিন স্থায়ী হইতে পারে না। পূর্ব্বতন ভারতবর্ষ তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। পূর্ব্বতন ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-মূলক সভ্যতার প্রথম আভাস প্রকাশ পাইয়াছিল। তৎকালীন হিন্দুগণ এই সার বুঝিয়াছিলেন যে "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ"। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন ন্যায়-ধর্ম্মের বর্ম্মে তাঁহারা সুরক্ষিত আছেন, বিদেশীয় লোক আসিয়া যে তাঁহাদিগের দেশ আবার আক্রমণ করিবে, এ কথা তাঁহাদের মনে আদৌ উদয় হয় নাই, তাঁহারা দিব্য নিশ্চিন্ত ছিলেন—পার্থিব বিষয়ে বড় মনোযোগ দিতেন না—পারমার্থিক বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। বিদেশীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে রীতিমত প্রস্তুত ছিলেন না—সুতরাং তাঁহারা বিদেশীয়দিগের হস্তে সহজে পরাভূত হইলেন। এই আক্রমণের ফল এই হইল—বৈদেশিকেরা সুসভ্য হিন্দুদিগের সংশ্রবে সভ্যতা-সোপানের এক ধাপ উপরে উত্থিত হইল—এবং সুসভ্য হিন্দুগণের সভ্যতা ও উন্নতি বৈদেশিকদিগের অত্যাচারে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সভ্যতার ইতিহাস পাঠে এই একটি বিষয় শিক্ষা পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর কোন অংশের কোন জাতি পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদিগকে বহু পশ্চাতে রাখিয়া—আপনি একাকী অত্যন্ত দ্রুতগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। তাদৃশ দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে গেলেই আবার পতন হয়। সমগ্র পৃথিবীকে সভ্যতার সমভূমিতে আনয়ন করিবার জন্য প্রকৃতি দেবীর নিয়ত চেষ্টা। গ্রীকেরা যখন সভ্যতার চূড়ান্ত সীমায় উত্থিত হয়—রোমকেরা আসিয়া তাহাদিগের দেশ জয় করে—এবং গ্রীকদিগের সংশ্রবে রোমকদিগের সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, আবার যখন রোমকেরা সভ্যতার চূড়ান্ত সীমায় উত্থিত হয়—গথ্ ভাণ্ডাল প্রভৃতি উত্তর প্রদেশীয় জাতিগণ তাহাদিগকে জয় করে—এবং বিজিত রোমকদিগের সংশ্রবে তাহারা আবার সভ্যতা পথের পথিক হয়। এইরূপ পৃথিবীর ইতিহাসে এক দিকে পতন, আর এক দিকে অভ্যুদয়, এক দিকে অবনতি আর এক দিকে উন্নতি নিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন পাত্রে জল রাখিয়া অগ্নিতে জাল দিলে যেমন পাত্রস্থ নিম্ন তলের জল-রাশি কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইলে উপরি ভাগে উত্থিত হয়—তাহার স্থান আবার অব্যবহিত উপরিস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল জল-স্তবক আসিয়া অধিকার করে—এইরূপ প্রক্রিয়ার ক্রমে ক্রমে সমস্ত জল-রাশির উষ্ণতা সমান হইয়া পড়ে—সেই রূপ সভ্যতা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সর্ব্বাংশে সমানরূপে

বিস্তৃত হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

“বল যার অধিকার তার” এই নীতিসূত্রটির বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। যদিও ইদানীন্তন ইউরোপে এই নিয়মটি পূর্ব্বতন সাঙ্গ্রামিক কালের ন্যায় প্রবল নহে, তথাপি এই নিয়মটির কার্য্য এখনও সেখানে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। এখন শুদ্ধ যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ হয় না, জাতীয় স্বার্থের উদ্দীপনায় যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়। ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন একবার এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ইউরোপের সকল রাজ্যের নির্দ্দিষ্ট সৈন্যদলের Standing army সংখ্যার লাঘব করা হউক, কিন্তু তাহাতে কেহই সম্মত হয়েন নাই, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই ফরাসিস জর্ম্মাণ যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। অতএব দেখা যাইতেছে ‘বল যার অধিকার তার’ এই নিয়ম এখনও মনুষ্য সমাজ হইতে তিরোহিত হয় নাই।

কিন্তু লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের স্থানে স্থানে এই নিয়মটি সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে হঠাৎ এইরূপ প্রতীতি হয় যেন তিনি ঐ নিয়মটির উৎকৃষ্টতা ও চিরস্থায়িতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন।

* * “In these Nature once more asserts her eternal law—once more gives the Hero who reigns not by the so-called right of conventional inheritance but of Might which alone gives you the right.”

* * * * * *

“And look how the nation blooms and flourishes once more under the sway of its just rightful king, because chosen by Nature on account of his acknowledged might and therefore his inviolable right of to rule.”

আমরা এই বলাধিকারের নিয়মকে উৎকৃষ্ট নিয়ম বলিতে পারি না—এই নিয়মানুসারে চলিতে কাহাকে উপদেশ দিতে পারি না। মানব সমাজের অপূর্ণতা হেতুই এই নিয়মটির অস্তিত্ব—ইহাকে আমরা কখন অনন্তকালের (Eternal Law) নিয়ম বলিতে পারি না। ন্যায়ের নিয়মই অনন্ত কালের নিয়ম। বলাধিকার-নিয়মের উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিলে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যুদ্ধ বিগ্রহের আর অবধি থাকে না—সুতরাং সভ্যতার গতি একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। বলই যদি অধিকারের নিয়ম হয়, তাহা হইলে কোন রাজ্যেরই শাসন-কার্য্য স্থায়ী পত্তন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দণ্ডে দণ্ডে রাজ-শাসনের পরিবর্ত্তন হয়। আজ এক রাজা এক রাজাকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত করিল—কল্য আর এক জন প্রবলতর রাজা আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহার স্থান আবার অধিকার করিল—প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করিয়া আছে—যখনই তাহার ক্ষমতা হইবে অমনি সে আর এক জনের বস্তু বলপূর্ব্বক অপহরণ করিবে। এই জন্যই সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে এই সাধারণ নীতিটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—যে দেশের যে চিরন্তন রীতি, সেই রীতি অনুসারে সাধারণ প্রজাদিগের ব্যক্ত কিম্বা অব্যক্ত সম্মতি-ক্রমে সেই দেশের রাজা কিম্বা শাসনকর্ত্তা কিম্বা শাসনকর্ত্তৃগণ সেই দেশের শাসন-ভার প্রাপ্ত হয়েন। যতক্ষণ না তাঁহারা ন্যায়ের নিয়ম লঙ্ঘন করেন ততক্ষণ তাঁহারা স্বীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না—অন্য দেশের লোক আসিয়া যদি কোন দেশের প্রজাদিগের বিনা সম্মতিতে সেই দেশ আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহারা সেই দেশের অনধিকার-প্রবেশী শত্রু বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহারা বলপূর্ব্বক ঐ দেশ অধিকার করিলেও—ঐ দেশে তাহাদিগের যে ন্যায্য অধিকার—ন্যায্য স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে এরূপ

বলা যাইতে পারে না। রাজনীতি-সম্বন্ধে এইরূপ একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা নিরূপিত হইয়াছে বলিয়াই পূর্ব্বতন সাংগ্রামিক কাল অপেক্ষা ইদানন্তীন সভ্য-সমাজে যুদ্ধ বিগ্রহের ক্রমশ হ্রাস হইতেছে। লেখক মহাশয় এক স্থলে বলিয়াছেন,—"Abundant blessings flow to the conquered inspite of the bloody resistance they might offer or curses and imprecations they might heap on their hated conquerors."—অনেক সময় পরাজিত জাতি জেতৃ-জাতির নিকট বহুবিধ উপকার প্রাপ্ত হয় সত্য—তাহা আমরাও স্বীকার করি এবং সে বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখও করিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া "বল যার অধিকার তার" এই নিয়মটিকে কখনই উৎকৃষ্ট নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। এক জন দস্যু এক জন দুর্ব্বলের ধন অপহরণ করিয়া দীন দুঃখীগণকে দান করিতে পারে, তাহা বলিয়া সে যে দস্যুতা-অপরাধে অপরাধী নহে কিম্বা সে যে সমাজের নিকট দণ্ডনীয় নহে, এ কথা কেহই স্বীকার করিবে না। জগৎ-বিধাতার কার্য্য-প্রণালীই এইরূপ যে তিনি অশুভ ঘটনা হইতেও কিঞ্চিৎ শুভ উদ্ধার করেন। তাহা বলিয়া যাহা অন্যায় তাহা কখনই ন্যায় হইতে পারে না। যদি লেখক মহাশয়ের বলিবার অভিপ্রায় এই হয় যে, সমস্ত পৃথিবীতে—এমন কি তাহার সভ্যতম অংশ ইউরোপেও যে নিয়ম এখনও কার্য্যতঃ প্রচলিত রহিয়াছে তাহারই কথা তিনি বলিয়াছেন, কোন্ নিয়মকে মনুষ্যসমাজের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত করা উচিত, সে বিষয় তিনি বলিতেছেন না; তাহা হইলে তাঁহার মতের সহিত আমাদিগের কিছুমাত্র অমিল নাই। ইহা সত্য যে, সমস্ত পৃথিবীতে এখনও 'বল যার অধিকার তার' এই নিয়মটি কার্য্যতঃ প্রচলিত রহিয়াছে। সভ্যতাভিমানী ইউরোপ মুখে এই নিয়মটি স্বীকার করেন না বটে কিন্তু কার্য্যতঃ এই নিয়মানুসারে অনেক সময়ে চলিয়া থাকেন। তবে অসভ্যদিগের সহিত তাঁহাদিগের এই প্রভেদ যে, অসভ্যেরা স্পষ্টাপষ্টি এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়, আর তাঁহারা তাহার উপর একটি ন্যায়-ধর্ম্মের আবরণ দিয়া স্বীয় অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রাখেন। তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া এই যে একটি ন্যায়-ধর্ম্মের আবরণ দিতে হয়, ইহাও অপেক্ষাকৃত উন্নতির লক্ষণ বলিতে হইবে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে বলাধিকারের নিয়ম ক্রমশই খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যতই মনুষ্যসমাজে সভ্যতার বাস্তবিক উন্নতি হইবে ততই 'বল যার অধিকার তার' এই নিয়মটির উপর "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" এই নিয়মটি জয়লাভ করিবে। ইউরোপীয় সভ্যতার এক্ষণে এতটুকু উন্নতি হইয়াছে যে, ইউরোপীয়েরা জ্ঞানত বুঝিয়াছেন যে ন্যায়ের নিয়মই শ্রেষ্ঠ নিয়ম, তবে অপূর্ণতা হেতু রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে স্বার্থ-অন্ধ হইয়া কার্য্যতঃ প্রায়ই এই নিয়মের ব্যভিচার করেন। এবার আমরা স্থানাভাব প্রযুক্ত এই খানেই শেষ করিলাম। লেখক মহাশয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভারতীর আগামী সংখ্যায় তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা।

আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধি পক্ষ নহি। স্ত্রীজাতি জ্ঞানানুশীলন করে, চিরন্তন কুসংস্কারের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারে এবং সভ্যসমাজে সাদরে গৃহীত ও সম্মানিত হয় ইহা অবশ্যই প্রার্থনীয়, কিন্তু এক্ষণে যে প্রণালী ক্রমে স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে,আমরা তাহার বিরোধী।

স্ত্রীশিক্ষার যে বিষময় ফল দাঁড়াইতেছে তাহা কেবল এই প্রণালী-দোষ। প্রথমতঃ যে সকল পুস্তক স্ত্রীলোকের পাঠ্য তাহার অধিকাংশই ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ অথবা ইংরাজী পুস্তকের আদর্শে রচিত। সেই সকল পুস্তক পাঠ করিলে অল্পে অল্পে স্ত্রীলোকের মনে বিজাতীয় ভাব প্রবেশ করে, এবং দেশীয় ভাবে বিদ্বেষ জন্মে। দ্বিতীয়ত স্ত্রীলোকের শিক্ষাকাল সাধারণত অতি অল্প; বাল্যকালে কএক বৎসর যা কিছু গুরূপদেশ পায় তাহাই তাহার চির জীবনের সম্বল। তৃতীয়ত ধর্ম্মোপদেশ-শূন্য নীতিশিক্ষা, যেখানে ধর্ম্ম নাই সেখানে নীতি দৃঢ়পদে দাঁড়াইতে পারে না, সুতরাং সেই নীতিশিক্ষা সলিলোপরি নিক্ষিপ্ত তৈলবিন্দুর ন্যায় মনের সহিত কখনই মিশ্রিত হয় না। চতুর্থতঃ উপন্যাস ও নাটকপাঠ, এতদ্দেশে যতগুলি উপন্যাস ও নাটক প্রকাশ হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশই জঘন্য। এক একটী উচ্চ নীতি কোন কোন গ্রন্থের লক্ষ্য বটে কিন্তু গ্রন্থকারেরা দুর্নীতিমূলক দোষাংশে অপেক্ষাকৃত এমন রসের আবির্ভাব করিয়া দেন যে ক্ষীণবুদ্ধি বিলাসিনীরা তাহাতেই মোহিত হন, গ্রন্থের সুনীতিমূলক গুণাংশে তাঁহাদের আর দৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে না। আমরা সংক্ষেপে স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী-দোষ প্রদর্শন করিলাম। এক্ষণে কিরূপে স্ত্রীশিক্ষা হওয়া উচিত তাহাই বিবেচ্য।

আমরা স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষার বিরোধী নহি। সকল প্রকার বিদ্যাই স্ত্রীলোকের জ্ঞাতব্য। জ্ঞানের দ্বার অবারিত; স্ত্রী বা পুরুষ হউন, যিনি জ্ঞানের যে বিভাগে যত দুর প্রবেশ করিতে চান অবশ্যই করিবেন। ঈশ্বর যখন নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককেই বোধশক্তি দিয়াছেন তখন তাহা চরিতার্থ করিতে না দেওয়া মহা পাপ। কিন্তু প্রধানত যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিলে স্ত্রীজাতি উৎকৃষ্ট গৃহিণী ও মাতা হইতে পারে তাহাই তাঁহাদের বিশেষ পাঠ্য। এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করিব।

প্রথম ধর্ম্ম ও নীতি গ্রন্থ। হিন্দুসমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, সুতরাং যত দিন না মত ও বিশ্বাসের একতা সম্পাদিত হয় তাবৎ কোন বিশেষ ধর্ম্ম এ সমাজের শিক্ষণীয় হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর ও পরকাল সকল সম্প্রদায়েরই মধ্যবিন্দু। শাপগ্রস্ত নাস্তিক ব্যতীত কেহই ইহার বিরোধিপক্ষ নয়। সুতরাং যে উপদেশে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল বিরাজমান এই ধর্ম্মপ্রবণ জাতি নতশিরে তাহা স্বীকার করিবে। হিন্দুসমাজে আপাতত এইরূপ সাধারণ ভাবে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হউক। ধর্ম্মের সহিত নীতি-বীজ রোপণ আবশ্যক। নচেৎ নীতিশিক্ষায় কোন ফল দর্শে না। অধুনা বঙ্গভাষায় যে সকল নীতি পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে কেবল মাত্র নীতিসূত্র আছে, উদাহরণ অতি বিরল। কিন্তু উদাহরণের সহিত নীতি যেমন ঝটিতি তাড়িতবৎ হৃদয়ে প্রবেশ করে, শুষ্ক নীতি-সূত্র সেরূপ নহে। এইরূপ নীতিগ্রন্থ কেবল রামায়ন ও মহাভারত। ইহা ভারতবর্ষের প্রকাণ্ড নীতি-সমুদ্র; গাম্ভীর্য্যে অতলস্পর্শ এবং বিস্তারে অনন্ত ও অসীম। ইহার এক একটী চরিত্র জীবলোকের জীবন্ত উপদেশ। এতদ্দেশে নির্দ্দিষ্ট দিনে ধর্ম্মযাজকেরা ধর্ম্ম ও নীতি ঘোষণা করেন না, দ্বারে দ্বারে ধর্ম্ম-প্রচারকও বিচরণ করেন না তথাচ আপামর সাধারণ যে নীতি ও ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত তাহা কেবল এই উভয় গ্রন্থেরই গৌরব ও মহিমা। ইহা হৃদয়হারী লোকচরিত্রে সত্যনিষ্ঠা, পিতৃভক্তি প্রভৃতি দেবস্পৃহনীয় গুণ সকল লোকের মনে সহজে মুদ্রিত

করিয়া দেয়। সুতরাং এই দুই নীতি-গ্রন্থই স্ত্রীজাতির পাঠ্য।

বর্ত্তমান কাল বিলাস-প্রধান কাল। অধিকাংশ স্ত্রীলোক গার্হস্থ্য কার্য্যে উদাসীন, কেবল বিলাস লইয়াই ব্যস্ত। আহার্য্য শোভা তাঁহাদের হৃদয়-স্বর্ব্বস্ব। এই জন্য অনেক স্বামী ঋণগ্রস্থ ও বিব্রত হইয়া পড়িতেছেন। গৃহকার্য্য দূরে থাক গৃহিনীগণের পুত্র কন্যা প্রতিপালনও অন্যের হস্তে। আমাদের স্ত্রীপাঠকেরা ক্ষমা করিবেন, আমরা স্ত্রীজাতির এইরূপ অন্যায় ও অত্যাচার দেখিয়া বস্তুতই ভীত হইতেছি। সামাজিক উন্নতির অর্দ্ধাংশ স্ত্রী-নিষ্ঠ, কিন্তু অধুনা স্ত্রীজাতির এইরূপ দূষিত আত্মম্ভরিতা আমাদের সেই আশার মূলোচ্ছেদ করিতেছে। বস্তুত তাঁহাদের ভোগসুখে ঈর্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু তাঁহাদেরই বিজয়িনী ইচ্ছা যে একটা নিরুপায় জাতিকে অধঃপাতে দিবে সেই জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। এক্ষণে ইহার প্রতিবিধান আবশ্যক। আমরা দেখিতেছি এইটি স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী-দোষ। বর্ত্তমান প্রণালীতে আদৌ গার্হস্থ্য-বিধান গৃহীত হয় নাই। পূর্ব্বকালে গৃহকার্য্য স্ত্রীজাতির একমাত্র অবলম্বন ছিল, এমন কি কোন সুসম্পন্ন গৃহস্থ সংসারে স্ত্রীলোক দাস দাসীসত্ত্বেও স্বহস্তে সমস্ত গৃহকার্য্য করিতেন। সকলের জন্য পাক করিতে অধিকার পাওয়া একটী পরম শ্লাঘার বিষয় ছিল। ফলত এই গৃহকার্য্যে অভিনিবেশ হেতু বিলাসের ভাব তাঁহাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এখন বিপরীত, পাক করা নীচ কার্য্য মনে করা হয়। গৃহস্থের কিঞ্চিৎ সমাবেশ হইলেই পাচক নিযুক্ত করা আবশ্যক। কিন্তু গৃহিনীগণের বিবেচনা করা উচিত যে ক্রীত ইচ্ছা কখনই সুফল প্রসব করে না। তাঁহাদের স্বহস্ত-প্রস্তুত অন্ন-সম্ভার যেমন পতিপুত্রের তৃপ্তির কারণ হয় এবং পবিত্র বোধ হইয়া থাকে, নিযুক্ত পাচকের প্রদত্ত অন্নে কখনই সেরূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ তাঁহারা নিজে যাহা প্রস্তুত করিবেন তাহা সর্ব্বাংশেই নিরাপদ। সম্প্রতি ইংলণ্ডে একটী পাক-সভা হইয়াছে। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং গিয়া তথায় আহার করেন এবং তাঁহার কন্যা ঐ সভার উদ্যোগা ও সভাপতি। এখানকার ইউরোপীয়দিগের যে আদর্শ তাহা নীচ ও জঘন্য। বোধ হয় এই অসৎ দৃষ্টান্তই আমাদের কুলকামিনীগণকে ভ্রান্তিজালে ফেলিয়া থাকিবে। যাহাই হউক, যেখানে শ্রম-কাতরতা ও আলস্য সেইখানেই বিলাসিতা, এই সর্ব্ব-শোষক বিলাস গৃহিণীগণের অস্থিতে অস্থিতে প্রবেশ করিতেছে। এক্ষণে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হওয়া উচিত!

এতদ্দেশে পুরুষের আহরণ ও স্ত্রীহস্তে পরিবেশন ইহাই চিরন্তনী রীতি। কিন্তু স্ত্রীজাতি যদি বিলাস-পরায়ণ হন তবে পুরুষ যতই আহরণ করুন কিছুতেই সঙ্কুলন হয় না। এই জন্য স্ত্রীলোকের মিতব্যয়িতা শিক্ষা আবশ্যক। যে সকল গুণ থাকিলে গৃহিণী হওয়া যায় তন্মধ্যে ইহা একটী প্রধান গুণ। এই গুণ অধিকার করিতে হইলে অগ্রে লোভ সংবরণ করা চাই। যে সংসারে পরিমিত ব্যয় ও সঞ্চয়, অলক্ষ্মী তাহার ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে পারে না। অঙ্কশাস্ত্র মিতব্যয়িতার সাহায্য করে, সুতরাং স্ত্রীজাতিকে কিঞ্চিৎ অঙ্ক শিখিতে হইবে।

এখন ইংরাজের রাজত্ব, গৃহে গৃহে ইংরাজী চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব। শিশুর পীড়া হইল, উজ্জ্বল বেশে একজন ইংরাজী চিকিৎসক আইলেন। দেশকাল পাত্রত অযথা কথা, মুখাগ্রে স্ফূর্ত্ত ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র কড়ায় গণ্ডায় প্রদর্শন ইহাঁদের কার্য্য। ইহাঁরা সেই অপগণ্ড শিশুর জন্য বেলেস্তরা ব্রাণ্ডি ও

কুক্কুটের ক্বাথ ব্যবস্থা করিলেন। এই বৈদেশিক লগুড়-প্রহারে যদি শিশু বাঁচে তবে তার পিতৃপুরুষের পুণ্যবল। ফলত যে দেশে যে জাতির সৃষ্টি সেই দেশে তাহার রোগ-শান্তির ঔষধও আছে। এইটি ঐশিক বিধান। আবহমান কাল ইহারই অনুসরণ করা হইয়াছে। পুরন্ধ্রীগণ সামান্য গাছ-গাছ্ড়া দ্বারা শিশুর চিকিৎসা করিতেন এবং তদ্দ্বারা বিলক্ষণ রোগ-প্রতীকারও হইত। এক্ষণে আর সেরূপ স্ত্রীলোকের আদর নাই, কিন্তু ইংরাজী তীব্র ও রুক্ষ ঔষধ প্রভাবে শিশুর কোমল শরীর যে চিররুগ্ন হইতেছে কেহই তাহা বুঝেন না। অকাল মৃত্যু ক্রমশই বাড়িতেছে কেহই তাহা দেখেন না। এক্ষণে ইহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। আমরা গৃহে গৃহে পূর্ব্ববৎ স্ত্রীচিকিংসক চাই। যাবৎ চিকিৎসা স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্ভূত না হইতেছে তাবৎ গার্হস্থ্য-বিধান পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইবে না। অতএব প্রত্যেক গৃহেই স্ত্রীলোকদিগের সামান্যরূপ দেশীয় প্রণালীর চিকিংসা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

শিক্ষা প্রকৃতি-সাপেক্ষ, যাহার যেরূপ প্রকৃতি শিক্ষা তদনুযায়ী হইলে বিশেষ ফলোপধায়ক হয়। পুরুষ ও স্ত্রী এই উভয়ের প্রকৃতি-বৈষম্য আছে, একটী বুদ্ধিপ্রধান অপরটী ভাবপ্রধান; কিন্তু যে প্রণালী বুদ্ধি অপেক্ষা ভাবের উত্তেজনা করে তাহাই স্ত্রীজাতির উপযুক্ত। এই জন্য সঙ্গীত ও চিত্র স্ত্রীলোকের শিক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু এই দুইটি বিদ্যা অবস্থা-সাপেক্ষ, সুতরাং ইহা যে সাধরণ বিধি নয় ইহা বলা বাহুল্য।

প্রথম সঙ্গীত। সঙ্গীতের দুইটী অংশ, একটী রাগ মান, অপরটী কবিত্ব, ইহার একতরের অভাবে সঙ্গীতের অঙ্গপূর্ণ হয় না। কবিত্ব মনের উপর যেরূপ কার্য্য করে রাগমান সেইরূপই করিয়া থাকে। ক্ষোভ ও বিক্ষেপ মানসিক সকল শক্তির মূলহর উৎপাত, তান-লয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীত উচ্চ অঙ্গের গণিতের ন্যায় মনকে বিভিন্ন বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক একতান করিয়া লয়। তখন তাহার সকল শক্তিই স্ফূর্ত্তি পায় এবং সে স্বর-লহরীর সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে। মনের স্বভাবই এই যে সে যাহার আয়ত্ত হয় তাহারই প্রকৃতি অধিকার করে। সঙ্গীতের প্রকৃতিই উচ্ছ্বাসময়, মনও উচ্ছ্বাসময় হইয়া উঠে। সঙ্গীতের এই রূপ উপকারিতা আছে বলিয়াই মহর্ষিগণ বেদের ফলশ্রুতি কীর্ত্তন কালে সামগানকে অনন্তফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলত যে জাতির উন্নতি আবশ্যক মূলে তাহার ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত অনুশীলন করা চাই। কিন্তু আমাদিগের এই দরিদ্র বঙ্গদেশে আর সে সঙ্গীতের আদর নাই, সচরাচর যে সমস্ত সঙ্গীত গীত হয় তাহা অতি জঘন্য, এমন কি পুত্র পিতার নিকট এবং ভ্রাতা ভগিনীর নিকট তাহা গাইতে কণ্ঠিত হন। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত এদেশের সেই অভাব পূরণ করিতেছে। ইহা উচ্চ অঙ্গের কবিত্বও উচ্চ অঙ্গের রাগ রাগিণীতে গঠিত। স্ত্রীলোককে এই সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সাধনার অসাধ্য কিছুই নাই, সাধনার গুণে কলকণ্ঠী অবলাদিগের ইহা অবশ্যই সুগম হইবে।

দ্বিতীয় চিত্রশিক্ষা। আমাদিগের মতে চিত্রকর ও কবি তুল্য-প্রতিষ্ঠ। উভয়েই প্রকৃতির অনন্ত ও অক্ষয় ভাণ্ডারের চিরভিখারী। এক জন বাক্যে অপরটী বর্ণবিন্যাসে প্রকৃতির হৃদয় চিত্রিত করিয়া থাকেন। প্রতিস্পর্দ্ধিতা সম্বন্ধে না হউক কিন্তু র‍্যাফেল ও কালিদাস কার্য্য সম্বন্ধে এক। ফলত ভাবুকতাই কবি ও চিত্রকর উভয়ের প্রাণ, কবির ন্যায় চিত্রকরকেও নানা

রসের অবতারণা করিতে হয়। স্নেহ বাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্য ভাব এবং ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি দেবভাব অন্তঃস্ফূর্ত্ত না হইলে চিত্রিত পদার্থে সজীবতা রক্ষিত হইতে পারে না। যখন রাজ্ঞী জেনগ্রে প্রাণদণ্ড হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেম তখন তাঁহার মুখশ্রীতে ভক্তি-রাগ জীবনের নশ্বর ভাব ও ঔদাস্য অঙ্কিত করিতে কিরূপ হৃদয় আবশ্যক, ব্যক্তিগত অবস্থার সহিত তন্ময়ীভাব প্রাপ্ত না হইলে বর্ণ তুলিকা ও ফলক মাত্র অবলম্বন করিয়া সেই চিত্র কদাচ প্রস্তুত হইতে পারে না। বাৎসল্যে অপনার হৃদয় আর্দ্র কর তবে একটী স্নেহের পুত্তলী অঙ্কিত হইবে। বীরমদে স্বয়ং মাতিয়া উঠ তবে তূলিকা বীরহস্তে তরবারির ভীম ভাব আনিতে পারিবে। যাহার যেরূপ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তিনি সেই পরিমাণে চিত্রকর। স্ত্রীজাতি ভাবের মূর্ত্তি, সুতরাং চিত্রই তাঁহাদের সম্পূর্ণ শিক্ষার উপযোগী।

এক্ষণে স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া চতুর্দ্দিকে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত। গ্রন্থকারগণ এই জন্য নিশীথে করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক চিন্তা করিতেছেন। পত্রসম্পাদকেরা এই জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ প্রস্তাবে জনসমাজ আকুল করিয়া তুলিতেছেন। বক্তা এই জন্য গগনভেদী স্বরে শ্রোতৃগণকে আবর্জিত করিতেছেন। দুইটি যুবা একত্র হইলে কেবল এই জল্পনা, দুইটি বিদ্যালয়ের অজাতশ্মশ্রু বালক একত্র হইলে কেবল এই ভাবনা। ফলত এই স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে একটি সাধারণ মত কিছুই দৃষ্ট হয় না। যাঁহার যে রূপ ইচ্ছা তিনি বাক্যে তাহা ব্যক্ত করিতেছেন এবং গুরুজনের অন্তরে আঘাত দিয়া কার্য্যে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাকেই বলে সমাজ-বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্য। কিন্তু আবহমান কাল স্ত্রীলোকের উপর হিন্দুজাতির অসাধারণ সম্মানের ভাব। রাশি রাশি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। হিন্দুরা স্ত্রীজাতিকে দেবভক্তিতে দেখে এবং কায়মনে তাহাদের পবিত্রতা কামনা করে। স্ত্রীলোককে মাতৃ-সম্বোধনে আহ্বান হিন্দুজাতি ভিন্ন আর কোন জাতিতে নাই। এক্ষণে সেই স্ত্রীসমাজে দেশ-কাল-বিরোধী কোন রূপ পরিবর্ত্তন দেখিলে প্রকৃত হিন্দু যে অন্তরে আঘাত পাইবেন তাহা বিস্ময়ের কথা নহে।

হিন্দুসমাজ পরিবর্ত্তনের বিরোধী নয়। অতি প্রাচীন কালের সহিত বর্ত্তমান সমাজের তুলনা করিয়া দেখ বুঝিবে এক্ষণে সে হিন্দু সমাজ আর নাই। ইহার বক্ষের উপর দিয়া নানা রূপ পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে ইহা অকাতরে তৎসমুদয় সহ্য করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই সমাজ ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার বিরোধী, যে পরিবর্ত্তন দেশ কাল পাত্র প্রখর স্রোতে প্লাবিত করিয়া আইসে তাহা এ সমাজের সহনীয় নয় এবং সে পরিবর্ত্তন এখানে স্থিরপদে দাঁড়াইতেও পারে না। সুতরাং স্ত্রীস্বাধীনতা এখন যে আকারে আসিতেছে ইহা হিন্দু ভাবের বিরোধী।

স্ত্রীজাতিকে চির-রুদ্ধ করিয়া রাখা অবশ্যই ঐশিক নিয়মের বিরুদ্ধ, কিন্তু হিন্দুসমাজ স্ত্রীলোকের উপর সেরূপ নির্যাতন করেন না। ধর্ম্ম ও নীতি স্ত্রীজাতিকে যতটা স্বাধীনতা দিতে বলে হিন্দুসমাজ তাহা দিয়াছেন এবং এখনও দিতে প্রস্তুত। ফলত হিন্দুস্ত্রী স্বাধীন। প্রতিদিন প্রভাতে রাজপথে বিচরণ কর দেখিবে সহস্র সহস্র সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলা দলবদ্ধ হইয়া স্নানার্থ নদীতীরে যাইতেছেন। কোথায় শ্রীক্ষেত্র, কোথায় বারানসী গয়া বৃন্দাবন, কোথায় প্রভাস তীর্থ, কোথায় কামরূপ, কোথায় সাগর-সঙ্গম, এই ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে অপর সীমায় হিন্দুস্ত্রী পদব্রজে নিয়ত বিচরণ করিয়া থাকেন। এই স্বাধীনতা আবার স্থান বিশেষে ভিন্নরূপ আকারে আছে। রাঢ়াঞ্চলের কোন কোন পল্লীগ্রামে বৎসরের মধ্যে একবার একটী মেলা হয়। তথায় ইতর ভদ্র স্ত্রীপুরুষ